প্রচলিত ভুল

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী

﴿ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨ ﴾ (سورة الزمر)

যারা কথা শুনে আর যা উত্তম তা অনুসরণ করে; ওদেরকেই আল্লাহ সৎপথে চালিত করেন এবং ওরাই বোধশক্তিসম্পন্ন। (সুরাঃ যুমার, আয়াঃ – ১৮)

******

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ٨ ﴾ (سورة الشعراء)

“নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন/বিশ্বাসী নয়।” (সুরাঃ আশ-শুয়ারা, আয়াঃ – ৮)

******

﴿ ... وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ٩٢ ﴾ (سورة سونس)

“নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আমার (আল্লাহর) নিদর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ (গাাফেল)।” (সুরাঃ য়ুনুস, আয়াঃ – ৯২)

الدار السلفية، ١٤٢٢هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المعصومي، بشير محمد
أخطاء شائعة – مكة المكرمة
٥٢ صفحه؛ **٢٢** سم.
ردك: X – ٦٥٥–٣٩–٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١– العقيدة الإسلامية– دفع مطاعن أ–العنوان
ديوي ٢٤. ٢٢/٣١٩٤

رقم الإيداع: ٢٢/٣١٩٤
ردك: X – ٦٥٥–٣٩–٩٩٦٠

ردك: X – ٦٥٥–٣٩–٩٩٦٠

প্রচলিত ভুল

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী

আদ-দারুত তালী'মীয়্যাঃ
মাক্কাতুল মুকাররামাঃ

cKvkK/†jLK KZK memZ msiw¶Z

Z‡e †KD webvg~‡j¨ weZi‡bi Rb¨ Qvcv‡Z PvB‡j †jL‡Ki AbygwZi cÖ‡qvRb|

cKvkK:

আবূ বাশীর মুহাম্মদ হুমায়ূন আব্দুল হামীদ আল-মা‘সূমী
মাক্কাতুল মুকার্রমাঃ
স‘য়ূদী ‘আরব।

প্রথম সংস্করণ ১৯৯২ (ঢাকা)
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪ (ঢাকা)
তৃতীয় সংস্করণ ২০০০ (ঢাকা)
চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত) ২০০১ (মাক্কাঃ)

†hvMv‡hv‡Mi wVKvbv:

বাশীর মুহাম্মদ আল-মা‘সূমী
পোঃ বক্স নং ১৩৪৪
মাক্কাতুল মুকার্রমাঃ
স‘য়ূদী ‘আরব।
টেলিফোন: ৫২৭৪১৭৯ (বাসা),
(মুবাইল) ০৫০৪৫০৭৫৫১ ফ্যাক্স: (০০৯৬৬-২) ৫২৭৫৩৬২
E.mail: bashir_masumi@yahoo.com
Web: www.talimiyyah.com

PROCHOLITO BHUL
(Mistakes in Vogue) written Bengali
By/ Bashir Muhammad Al-Ma`sumi

cÖKvk‡Ki wb‡e`b

প্রচলিত ভুল এক ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক বই। সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। অ-ইসলামী ‘আকীদার মুকাবেলায় তেজদীপ্ত বিপ্লব। ইসলামী ‘আকীদাঃ ও বিশ্বাসের যুগোপযোগী সংস্কার।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় মুসলিম সমাজের যে সব রসম-রেওয়াজ ইসলামের নামাবলী জড়িয়ে শোভাবর্ধন করছে আসলে তা বৈদিক ও বৈদ্ধ ধারণা বা ফিকরার কার্বন কপি। সেখানকার মুসলিম সংস্কৃতি বৈদিক সংস্কৃতিরই সংমিশ্রণ; ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনের বিপরীত। এ ছাড়া যে সব প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলোও ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। গড্ডালিকা প্রবাহে অনেকেই নিমজ্জিত। এ ব্যাপারে মননশীল আলেম, প্রকৃত সংস্কারপন্থী মুসলিমের ভীষণ অভাব।

বাশীর আল-মা’সূমী এ বইয়ের মধ্যে গবেষণামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ‘আরবদের সিন্দু বিজয়ের পথ ধরে ভরতবর্ষে ইসলামের দ্রুত প্রচার ও প্রসার হলেও পরবর্তীকালে সেখানে সঠিকভাবে ইসলামের পরিচর্যা হয় নি। আর যারা তা করেছিল তারা ‘আরব নয়; সদ্য দীক্ষিত অনারব যারা প্রকৃত ইসলাম ও ‘আরব সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পারে নি। ক্রমশ তারা ভারতীয় জীবনধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল; সেখানকার বহু রসম-রেওয়াজ তারা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় নয়া মুসলিমগণ তাদের মন থেকে প্রাচীন ধারণা ও বিশ্বাসের মুলোৎপাটন করতে পারে নি।

ভারতীয় মুসলিম সমাজের উপর অ-ইসলামী প্রভাব, রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক তাগিদ, সামাজিক প্রতিক্রিয়া, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ ইত্যাদি বিষয় তিনি অতি সূক্ষ্নভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং সুস্পষ্ট দলীল সহকারে প্রমাণ করেছেন যে প্রচলিত ইসলাম (Popular Islam) cKZ Bmjvg (Real Islam) নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে তিনি অ-ইসলামী ’আকীদাঃ, ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে দেখতে পেয়েছেন এবং সেগুলো তরক করে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফেরার আহবান জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ ধরনের মননশীল গবেষণামূলক কাজ দুর্লভ এবং বিসয়বস্তু অত্যন্ত যুপোপযোগী। ভাষা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও ছন্দোময়। ইসলামী বইয়ের মধ্যে এ ধরনের সুললিত ভাষা, দলীল সম্বৃদ্ধ সুখপঠ্য বই দূর্লভ।

বইটির অপরিসীম গুরুত্ব, সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও গভীর প্রয়োজন অনুভব করে আমরা এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছি। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আমরা দ’য়া করি যে, লেখকের আন্তরিক প্রয়াস ও পরিশ্রম আর আমাদের নিরলস প্রচেষ্ঠা কবুল করুন এবং এ বইয়ের দ্বারা সাধারণ মুসলিম যেন ইসলামের প্রকৃত রূপ ও হাকীকত উপলব্ধী করতে সক্ষম হন। আমীন ছুম্মা আমীন !!!

BwZ -cÖKvkK

ভূমিকা

নামকরণে ইসলামী পদ্ধতী বই লেখার সময়ে দীর্ঘ গবেষণা করে উপলব্ধি হলো যে পাক-ভারত উপমহাদেশে অধিকাংশ নামই উসূল মুতাবেক নয় বরং গালৎ। এ গবেষণার সাইড এফেক্ট (পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া) হলো বর্তমান নিবন্ধ: প্রচলিত ভুল। নামকরণের বিষয় ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ তবে তা গৌণ; কিন্তু মৌলিক বিষয়েই সাধারণ মানুষ এমনকি বহু 'উলামারও 'ইলম নেই। 'আকীদাঃ সাহীহ ও সুদৃঢ় না হলে তো 'ইবাদত একেবারেই গায়ের মাকবূল বা অগ্রহণযোগ্য। ইসলামী 'আকীদার সর্বপ্রথম বিষয় হলো মা'রিফাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। সে জ্ঞানে কোন মুসলিম যদি সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল না হয়, আল্লাহর প্রকৃত নামই না জানে, আল্লাহর সরূপ, প্রকৃতি, ক্ষমতা, অবস্থান ও গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকে তাহলে সব 'আমল/'ইবাদত পন্ডশ্রম। 'আকীদাঃ/ঈমান হচ্ছে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত, ফুলে-ফলে বিকশিত, সতেজ-শ্যামল বৃক্ষের মতো যার মূল সরস মাটির গভীরে প্রোথিত; সেখান থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় রসদ। ফলে তার কান্ড উন্নত শিরে উর্ধ্বাকাশে উত্থিত হয়ে ধরণীর বুকে শোভা বর্ধন করে। মানুষের মনের জমিন যদি উর্বর না হয়, ঈমানের শিকড় যদি মনের গভীরে বদ্ধমূল না হয তো কিভাবে ঈমানের বৃক্ষ রসদ আহরণ করবে? কিভাবে তা বিকশিত হবে এবং ফলদায়ক হবে?

পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বহু অ-ইসলামী বিশ্বাস, রসম রেওয়াজ ও প্রতিশব্দ ইসলামের নামে প্রচলিত/মাশহুর। সে সব গালৎ মাশহুরের অবগতির জন্যই এ বইয়ের উপস্থাপনা। বইটি পাঠ করে পাঠক/পঠিকা মৌলিক ভুলগুলো শুদ্ধ করে নিলে লেখকের প্রশ্রম ও প্রচেষ্টা সফল হবে।

نسأل الله أن يعلمنا ما لم نعلم من دينه الحنيف ويهدينا إلي الصراط المستقيم وهو الهادي إلي سواء السبيل.

লেখক:
বাশীর মুহাম্মদ আল-মা'সূমী
মাক্কাতুল মুকার্রমাঃ
রামাদান, ১৪২৩হিজরী; ২০০২খ্রীঃ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আমার লেখা বই নামকরণে ইসলামী পদ্ধতির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর জন্য ১৯৯২ সালে ঢাকায় পৌঁছুলে সা'য়ূদী এমব্যাসীর বিশিষ্ট কয়েকজন সা'য়ূদী কর্মীদের সাথে পরিচয় হয়। তারা এ বই ছাপাতে চাইলে বইয়ের শেসে প্রচলিত ভুল জুড়ে দেয়া হয়েছিল। পাঠকদের জন্য এটা ছিল বোনাসের মতো বাড়তি পাওনা। সে সময় ঢাকার বংশালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আব্দুস সাবূর এবং কুমিল্লার এক বিশিষ্ট সমাজসেবী মাযহারুল হাক চৌধূরী সাহের প্রচলিত ভুল কে আলাদা করে ছেপেছিলেন। তারপরেও হাজী সাহেব আবার একবার ছেপেছিলেন। শেষে ২০০০ সালে হাজী সাহেব নতুনভাবে টাইপ করে প্রকাশ করেছিলেন। সে কপি আমার কাছে পৌঁছুলে দেখি তাতে অনেক ভুল। তাই আমার নিজ কম্পিউটারে বাংলা প্রোগ্রাম সেট করে নিজের তত্বাবধানে নতুন করে টাইপ করা হয়। এবং ২০০২ সালে মাক্কাঃ শারীফ থেকে তা বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণ বাজারে প্রচার হলে সকলের কাছে দারুণভাবে সাড়া পড়ের যায়। অনেকের মতে এ বইটা এক নীরব বিপ্লব। ইসলামের নামে তথাকথিত 'আকীদাঃ ও ধারণার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ; কিন্তু এ বইয়ের ব্যাপারে অনেক পাঠকের নালিশ হলো যে বইয়ে বহু ফিক্‌রাঃ বা ধারণা খুবই সংক্ষিপ্ত, যেমন ঃ মানসূর আল-হাল্লাজের আনাল হাক বা আমিই পরম সত্য, ইবন আল-'আরাবীর ওহ্‌দাতুল ওজুদ, শংকারাচার্যের অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। পাঠকের দাবি হলো যে এসব বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ চাই। সে দাবি পুরণের উদ্দেশ্যে এ সংস্করণকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও করা হবে। ইন শা-আল্লাহ।

এ সংস্করণের প্রচলিত ভুল পড়ে পাঠক-পাঠিকা অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন এবং ইসলামের নামে যে অ-ইসলামকী 'আকায়েদ ('আকীদাঃ শব্দের বহুবচন), 'আমল ও প্রথা চলে আসছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবেন এবং গবেষণামূলক আরও কিছু লেখা পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে পেশ করার ইচ্ছা আছে। তাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এ ব্যাপারে দু'য়ার দরখাস্ত রইল।

পরিশেষে বলিঃ আল্লাহর জন্যই সকল হামদ ও শুকর (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের উপর।

লেখক:

বাশীর মুহাম্মদ আল-মাসূমী
মাক্কাতুল মুকাররমাঃ
মুহাররম, ১৪২৫হিজরী; মার্চ ২০০৪খ্রীঃ।

সূচীপত্র

১.	সবিনয় নিবেদন	১
২.	আল্লাহ্ না খোদা ?	৩১
৩.	আল্লাহ্ সাকার না নিরাকার ?	৩৫
৪.	আল্লাহ্ আকাশের উপর না সর্বত্র বিরাজমান ?	৬০
৫.	রাসূলুল্লাহ্ না হুজুর পাক না আঁ হযরত ?	৭৫
৬.	'আলেম না শায়খ না মাওলানা/মৌলভী ?	৭৮
৭.	মুসলিম না মুসলমান ?	৮০
৮.	হাদরত না হুজুর/হজরত ?	৮১
৯.	হারাম শরীফ না হেরেম না হরম ?	৮৩
১০.	শারীফ শব্দের তাৎপর্য	৮৮

‘আরাবী হারফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কে কিছু কথা

‘আরাবী ভাষার সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য, ব্যঞ্জনাময় স্বকীয়তা এবং ধ্বনি প্রকরণের সূক্ষ্মতার কারণে এ ভাষার বহু শব্দ অন্য ভাষায় উচ্চারণ সম্ভব নয়, যেমন: ض হারফ। অন্য কোন ভাষাতে প্রায় সমোচ্চরিত চার হারফ নেই, যেমন: ج ذ ز ظ। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও স্বাভাবিক কারণে ‘আরাবী শব্দের বানান বিভ্রাট দেখা যায়। এ অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটি (East Bengal Language Committee) গঠিত হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটি যে প্রতিবর্ণায়ন তালিকা পেশ করে তাতে ذ/ظ = জ, ز = জ, ص/س = ছ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবে বাংলা ভাষার বানান, ব্যাকরণ ও বর্ণ-সংস্কার কমিটি গঠন করেন। পরবতীকালে আরও কমিটি গঠিত হয়। সে সব কমিটির সুপারিশের আলোকে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবর্ণায়ন কমিটি গঠন করে। সে কমিটির অনুসৃত নীতিমালার ভিত্তিতে ‘আরাবী-ফারসী শব্দের এক প্রতিবর্ণকৃত তালিকা প্রণীত হয় যা পূর্ববতী সব প্রতিবর্ণায়ন থেকে বেশী সঠিক। ১৯৮৫ সালে প্রথম বাংলা বই লেখার সময় যে বানানরীতি গ্রহণ করেছিলাম তার সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রবর্তিত বানানরীতির অনেক মিল আছে; সামান্য কিছু অমিলও আছে। কয়েক ক্ষেত্রে তাদের বানান নিয়মমাফিক হলেও আমার কাছে তা প্র্যাকটিক্যাল মনে হয় নি। ‘আরাবী ভাষার কাসরাঃ বা যের ই-কারান্তই হয়। সে ফরমূলা অনুযায়ী ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিম্নলিখিত শব্দের বানান লিখেছেন এভাবে:

عابد – ‘আাবিদ	عبيد – ‘আবীদ	حاكم – হ্যাকিম	حكيم – হাকীম
ذاكر – য্যাকির	ذكير – যাকীর	شاهد – শ্যাহিদ	شهيد – শাহীদ
سالم – স্যালিম	سليم – সালীম	ناصر – ন্যাসির	نصير – নাসীর

প্র্যাকটিক্যালি এ বানান রীতি অনুসৃত হলে বাংলা ভাষার উপরোক্ত সমোচ্চরিত শব্দগুলোর উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। ‘আরাবী শব্দে দীর্ঘ আ-কারান্ত হারফের পর কাসরাঃ বা যের থাকলে তা হালকাভাবে উচ্চারিত হয়। তাই ই-কারান্তর বদলে এ-কারান্ত হয়, যেমন:

عابد – আ্যাবেদ	عبيد – ‘আবীদ	حاكم – হ্যাকেম	حكيم – হাকীম
ذاكر – য্যাকের	ذكير – যাকীর	شاهد – শ্যাহেদ	شهيد – শাহীদ
سالم – স্যালেম	سليم – সালীম	ناصر – ন্যাসের	نصير – নাসীর

এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ ও পার্থক্য সহজসাধ্য এবং লক্ষণীয়।

পুনরায় বলি: 'আরাবী কাসরাঃ বা যের সর্বক্ষেত্রে ই-কারন্তেই লেখা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র দীর্ঘ আলীফের পরই এ-কারন্তে লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত ডবল আকার দিয়ে বানান রীতি আংশিকভাবে গ্রহণ করেছি কেননা সব বানানের ক্ষেত্রে সে রীতির প্রচলন কি সম্ভব? বাংলা ভাষায় প্রচলিত হাজারো 'আরাবী শব্দকে ডবল আকার দিলে লিখতে হবে: আল্লাাহ (আল্লাহ), রাহমাান (রাহমান), ঈমাান (ঈমান), ইসলাাম, কুরআান, হালাাল, হারাাম, আাদাম, ইবরাাহীম, 'আালেম, কাাসেম, ইত্যাদি। পাঠকের কাছে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? যদি তা হয় তবে পরবর্তীতে এভাবেই লেখা হবে। এ বইয়ে আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতে ডবল আকার দিয়ে লেখা হয়েছে যেখানে 'আরাবী শব্দের পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়েছে যাতে পাঠক 'আরাবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো বাংলা ভাষায় অ-কারন্ত শব্দের প্রচলন প্রচুর, যেমন: অলস, একক, কমল, খড়ম. গগণ, ঘটক, তপন, থই, দর্শক, ধরন, পবন, ফলন, বলদ, ভরণ, মরণ, হরণ, ইত্যাদি; কিন্তু কোন 'আরাবী শব্দই অ-কারন্ত হয় না; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

বাংলা ভাষা যে সব 'আরাবী শব্দ গ্রহণ করেছে তা বাঙ্গালী ছাঁচেই লেখা হয়, যেমন: কলম, কবর, খতম, খবর, গজল, গজব, জলসা, জমজম, তলব, তরফ, দখল, নকল, নগদ, ফসল, ফজর, বদল, বরকত, মলম, মহল, শরবৎ, সফর, হজ্জ, হক ইত্যাদি অসংখ্য শব্দগুলো বিশুদ্ধ 'আরাবী। 'আরাবী ভাষায় সেগুলোর উচ্চারণ হয় আকার দিয়েই, যেমন: কাল্‌ম, খাত্‌ম, খাব্‌র, গাজব, জাল্‌সাঃ, যামযাম, তালব, নাক্‌ল, মাহল, হাজ্জ, হাক, ইত্যাদি।

এই বইয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান রীতিতে লেখা হয়েছে কেননা ঐ ধরনের 'আরবী শব্দ বা লাফযগুলোকে বাংলা ভাষা একবারে হজম করে নিজ শব্দের খাজনা'র তাকত বাড়িয়েছে। 'আম আদমী ক'জন তার খবর রাখে? কে বা তা খেয়াল করে? এখানে (হাজম/هضم) (খাযানাঃ/خزانة) (তাকাঃ/طاقة) ('আাম/عام) (আাদামী/آدمي) (খাবর/خبر) (খেয়াল/خيال) ইত্যাদি শব্দগুলো নির্ভেজাল 'আরাবী শব্দ। হজম/হাযম শব্দটি খালেস 'আরাবী লাফয। হজম শব্দের বাংলা হলো পাচনক্রিয়া বা পরিপাককিয়া। ভোজনপ্রিয় অধিকাংশ বঙ্গাবাসীর এ ব্যাপারে 'ইলম নেই। এ ধরনের বহু 'আরাবী শব্দ বাংলা ভাষা কবূল করে নিয়েছে।

১৯৮৫ সালের কলিকাতার দেশ পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে একজন লেখেছিলেন: "কোন ভাষা অন্য ভাষাকে Kej করলে তা B¾‡Zi হানি হয় না বরং তার ZvKZ বাড়ে ...।" উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে তিনটি বিশিষ্ট শব্দই নির্ভেজাল 'আরাবী শব্দ। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকদের এ

ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করার মানসিকতা ও সৎসাহস নেই অথচ পশ্চিমবাংলার হিন্দু লেখকদের এতে হিনমন্যতা ও দ্বিধা নেই। দু-বাংলার 'আলেম শ্রেণী বা মাদ্রাসা ফারেগ wKQ †jLK Ô আরাবী শব্দগুলো তরক করে নির্ভেজাল বাংলা শব্দ যোগ করে যেমন: সফর শব্দের পরিবর্তে ভ্রমণ, কবুলের বদলে গ্রহণ ও 'আলেম শব্দের মুকাবেলায় বিদ্বান বা মণিষী ইত্যাদি। এভাবে তারা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা প্রয়োগ করে তাদেও ভাষার বাহাদুরী দেখাতে চাইছেন বা প্রগতিশীলদের জাতে উঠতে চাইছেন। তাদের বাংলা ভাষায় জ্ঞান যে সীমিত তা সর্বজনবিদিত কেননা মাদ্রাসায় বাংলা পড়ান হয় না; আর যা সামান্য পড়ান হয় তা লেখালেখির হাত খুলে না- এর জন্য প্রয়োজন ভাষার উপর দখল ও প্রচুর পড়াশুনা। এবং সাহিত্যে পড়াশুনা। আল-কুরআন বুঝতে হলেও 'আরাবী সাহিত্য বুঝতে হবে। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সব 'আলেম গ্রহণযোগ্য বাংলা লেখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কথা আলাদা।

'আরবী ভাষায় (ة) তা' মারবূতাকে অর্থাৎ গোল তা কে স্ত্রী-কারান্ত তা' বলা হয়। আমাদের পূর্ববতী 'আলেমগণ কোন কোন কালিমার শেষে ত'র উচ্চারণ করেছেন কখনও করেন নি; যেমন: سنة সুন্নত, شريعة শরিয়ত, صلاة সালাত, زكاة যাকাত, رحمة রহমত, ইত্যাদি। অনেক কালিমার শেষে এ অক্ষর থাকা সত্ত্বেও ত'র উচ্চারণ করা হয় না, যেমন: مكة মক্কা, مدينة মদিনা, كلمة কালেমা, خليفة খলিফা, خديجة খাদিজা, فاطمة ফাতেমা, عائشة Avয়েশা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, سورة'র উচ্চারণ করা হয়: সূরা কিন্তু آية 'র উচ্চারণ: আয়াত। অনুরূপভাবে رحمة 'র উচ্চারণ করা হয়: রহমত কিন্তু رحيمة'র উচ্চারণ: রহিমা; سورة 'র উচ্চারণ: সুরা আর صورة 'র উচ্চারণ: সুরত- অথচ সব হারফের শেষে (ة) রয়েছে। তবে কেন এ সব শব্দের শেষে ত'র উচ্চারণ হয় না? (ة) তা' মারবূতার উপর এমন অবিচার কেন? দুর্বল হারফটি স্ত্রী-কারন্ত বলেই কি তাকে নিয়ে এমন হেলাফেলা? আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত/পাঠকালে (ة) কে ছেড়ে দিলে দশ নেকীর ঘাটতি হবে, পড়া অশুদ্ধ হতে পারে। কোন মু'মিন কি সে ছাওয়ার হতে বঞ্চিত হতে চায়? আসলে তা' মারবূতাঃ কোন একক শব্দে থাকলে তার উচ্চারণ উহ্য থাকে, তবে পরের শব্দের সাথে যুক্ত হলেই তার প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশ পায় যেমন: مكة المكرمة মাক্কাতুল মুকাররমাঃ, المدينة المنورة আল-মাদীনাতুল মুনাওওয়ারাঃ, خديجة الكبري খাদীজাতুল কুবরা, فاطمة الزهراء ফাতেমাতুয যাহরা, خليفة النبي খালীফাতুন নাবী, ইত্যাদি।

ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রবর্তিত (ة) 'র প্রতিবর্ণ বিসর্গ (ঃ) সঠিক ও যথার্থ হয়েছে কারণ اَلْحَمْد لِلّٰه আল-হামদু লিল্লাহি'র হামদ'র প্রথম অক্ষর হ এবং আল্লাহ'র শেষ অক্ষরও হ। একটা বড় হা অন্যটা ছোট হা বা হে। (ة) অর্থাৎ তা মারবুতা কে হ'র উচ্চারণ করা হলে হ'রই ছড়াছড়ি হয়। তবে ওয়াকফ

হলে আ বা হ'র মাঝামাঝি এক ধরনের উচ্চারণ হয় যেমন, নরাঃ। নর শব্দের সংস্কৃত ধাতুরূপ এক বিশেষ বিভক্তিতে এভাবেই উচ্চারিত হয়। তাই বিসর্গ (ঃ) অক্ষরটিই হলো (ঃ) 'র সঠিক প্রতিবর্ণায়ন।

এই বইয়ের অধিকাংশ বানান-রীতি ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুসৃত নীতিমালার সাথে মিল আছে। তবে যে সব 'আরাবী শব্দ একেবারে বাংলা হয়ে গিয়েছে তাকে সেভাবেই লেখা হয়েছে, যেমন: Kjg, Lei, Zje, ইত্যাদি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যে প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে তা চূড়ান্ত ও নির্ভুল বলা চলে না তবে গ্রহণযোগ্য। এর থেকে কোন উত্তম বানান রীতি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি বা অন্য কোন পক্ষ থেকে এ ধরনের চেষ্টাও করা হয় নি। আর তেমন কোন সচেতন পক্ষ নজরেও পড়ে না। ইসলামী মনোভাবাপন্ন লেখকগণ এ রীতি গ্রহণ করলেও অধিকাংশ 'আলেম যারা বাংলায় লেখেন তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। এক বিখ্যাত 'আলেমের মতে বা অনেকে মনে করেন বাংলা-ইংরেজী পড়া ব্যক্তিরা 'আরাবী ভাষায় জাহেল; তাই তাদের বাংলা 'আরাবী প্রতিবর্ণায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনি প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত। 'আলেম শ্রেণী এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। বাংলা ভাষায় পন্ডিত ও 'আরাবী ভাষায় 'আালেমদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। এতে দু-দলেরই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। তবুও এ ধরনের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপও অনেকের কাছে স্বীকৃতি পায় নি যাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, একাদেশদর্শী ও অনুদার।

Transliteration 'র ক্ষেত্রে সব ভাষাতেই প্রতীক ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় 'আরাবী প্রতিবর্ণায়নের প্রতীক ব্যবহার করার সময় এসেছে। বর্তমান কম্পিউটার প্রযুক্তির যুগে তা সম্ভব। দুঃখের বিষয় যে এ পর্যন্ত 'আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি। প্রত্যেকেই আপন খেয়ালখুশি মতো বানান লেখে চলেছেন; তাই ث ও س স হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। س 'র অক্ষর স, আর ث'র ছ। حديث বানান হাদীস'র বদলে হাদীছ হলেই অনেকখানি ঠিক হবে কেননা বাংলা ভাষায় স'র উচ্চারণ শ'র মতো যেমন সকল, সব, সময়, ইত্যাদি কিন্তু স'র প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশ পায় সিলেট, সিস্টেম, সিলেবাস শব্দের প্রথম স-তে। স'র প্রকৃত উচ্চারণ আর ব্যবহৃত উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় স'র প্রকৃত উচ্চারণ শোনা যায়।

হাদীছ'র বানান হাদীস হলে শেষের স শ'র মতো উচ্চারিত হতে পারে অথচ হারফটি ছ'র কাছাকছি। হাদীছ শব্দটি বিকৃত হয়ে হদিশ হয়েছে। ع'র প্রতিবর্ণ 'য়। তাই دعاء 'র বানান লেখা হতো দোয়া কিন্তু দ'র নিচে উকার দিলে সঠিক হবে কেননা দাল হারফের উপর পেশ আছে, যেমন: মুহাম্মদ, মোহম্মদ নয়। سعودي'র বানান সা'য়ূদী/ Saudi তবে উচ্চারণ হবে স'য়ূদী বা সো'য়ূদী। সৌদি

বানান লেখা হলে পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট سعودي শব্দের হাক আদায় হয় না, বরং ভুল। ع'র অক্ষর 'য় হলেও বাংলা ভাষায় প্রথম শব্দে q দিয়ে শুরু হয় না তাই عالم 'র বানান 'য়ালেম না হয়ে 'আলেম লেখা হয়, علم 'য়িলম না হয়ে 'ইলম এবং عمر 'য়ুমর না হয়ে 'উমর ইত্যাদি। এ নিয়ম অনুসরণ করতে অনেকেই دعاء 'র দু'য়ার বানান লেখেন দোআ বা দুআ। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের পর সরাসরি স্বরবর্ণ বসে না; শুধু তার সংক্ষিপ্ত রূপই ব্যবহৃত হয়। তবে বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে সে নিয়ম সব সময় পালন করা সম্ভবও নয়।

এ ধরনের কিছু বানান নিয়ে বিবেচনা করার সময় এসেছে। বানানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তন সব ভাষাতেই প্রযোজ্য। সাবেক Mecca, Calcutta, Dacca 'র বানান এখন Makkah, Kolkata, Dhaka। তাহলে সাবেক সৌদি বানান এখন স'য়ূদী দেখে কেউ আঁতকে উঠছেন, কেউ বেজার হচ্ছেন আর কিছু পন্ডিতন্মস্য মহজান এর বিরুদ্ধে জেহাদ করতে প্রস্তুত হচ্চেন।

ভাষা গতিশীল। মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে ভাষার বিবর্তন ও পরিবর্তন আসে। পুরাতন পদ্ধতি থেকে অভিনব পর্যায়ে উন্নত হয়। বাংলা ভাষা অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার হয়েছে। চর্যাপদের বাংলার সাথে আজকের বাংলা ভাষার মিল সামান্যই। সেক্সপীয়ার থেকে বেকন এবং ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী থেকে বর্তমান ইংরেজীর অনেক ফারাক।

শতবর্ষ পূর্বে 'আলেমগণ 'আরাবী ভাষার যে বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করেছিলেন তা অনেক গ্রহণযোগ্য আর অনেকেই পরিবর্তনযোগ্য। সে কালের 'আলেম সম্প্রদায় থেকে এ কালের 'আলেমদের বাংলা ভাষায় তেমন চর্চা হয় নি, উন্নতিও হয় নি (ইল্লা মাা শাা-আল্লাহ) কেননা বাংলা ভাষায় তাদের পড়াশুনার সুযোগ ছিল না। আর বাংলা ভাষায় ইসলামী বইও ছিল না; এখনও তেমন নেই। তবুও তাবলীগের গুরু দায়িত্বকে তারা চেপেও রাখেন নি। বাংলা ভাষায় তাদের স্বল্প জ্ঞান নিয়েই তারা ইসলামের খেদমত করে চলেছেন। তারাই তো নাবীর ওয়ারিছ। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। বর্তমান যুগে তাদেরই মেহনতের ফসলকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস; পরস্পরের প্রতি মূল্যায়ন।

'আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী। বাংলা ভাষায় পন্ডিত ও 'আরাবী ভাষায় 'আলেমদের এ যৌথ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। জাযাহুমুল্লাহু খাইরান...।

BIZ/
গুণমুগ্ধ লেখক

প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কে আরও বাড়তি কথা

‘আরাবী ভাষার (أ) আলীফ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: আ যেমন (اَللّٰه) আল্লাহ। (ع) আঈন হারফের প্রতিবর্ণ: য় যেমন, (دعاء) দোয়া। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ দাম্মা বা পেশ (ُ) কে ওকারের প্রতিবর্ণ করতঃ مُحَمَّد শব্দের বানান লেখতেন মোহাম্মদ বা মোহাম্মাদ (গড়যধসসধফ)। এখন লেখা হচ্ছে মুহাম্মদ বা মুহাম্মাদ (গঁযধসসধফ)। এভাবে লেখাই সঠিক। তাই দোয়ার বানান ওকার না হয়ে উকার হবে, যেমনঃ দু‘য়া। ‘য়-এর আগে উল্টো (أ) ব্যবহার করে (أ) আলীফ হারফের সাথে পার্থক্য করা হয়েছে, যেমন, (اَللّٰه) আল্লাহ, আর য়-এর আগে উল্টো কমা যোগে عبد الله ‘আবদুল্লাহ, عبد الرحمن ‘আবদুর রহমান, عمر - ‘উমর, عبادة – ‘ইবাদাঃ, এবং عيد ‘ঈদ। বাংলা ভাষায় (ع) হারফটি প্রতিবর্ণ য় অক্ষর দিয়ে কোন শব্দ দর্‌ হয় না তাই বাধ্য হয়ে আইন অক্ষর দিয়ে দর্‌ হওয়া শব্দকে ‘আ ‘ই, ‘ঈ, ‘উ, ‘ঊ অক্ষর দিয়েই দর্‌ করতে হয়। আর এ ধরনের অক্ষর৲লোর প্রথমে উল্টা কমা যোগ করলে আইন অক্ষরের প্রতি ইশারা বোঝায়। (ع) বিশিষ্ট ‘আবদুল্লাহ শব্দের বানানের প্রথম অক্ষর ‘আ- দিয়ে দর্‌ করতে হয়, আর তা দেখে যারা দু‘য়ার বানান দোআ বা দুআ লেখছেন তারা ভেবে দেখেন না যে (ع) আঈন হারফের প্রতিবর্ণায়ন অবস্থানভেদে ‘আ ‘ই, ‘ঈ, ‘উ, ‘ঊ, ‘য় হয়ে থাকে। যারা (ع) আইন হারফের প্রতিবর্ণায়নকে সর্বদা আ দিয়ে লেখেন তারা পাঠক-পাঠিকাদেরকে চর্চাপদ যুগের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ব্যাপারটা নিয়ে তারা ফিকির করেছেন কী? স্মরণীয় যে ব্যঞ্জনবর্ণের পর সরাসরি কোন স্বরবর্ণ বসে না, আর বসলেও সংক্ষিপ্তরূপে তা ব্যঞ্জন বর্ণে যোগ হয়। তাই দুআ বা দোআ বানান কোন মতেই ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নয়। ‘আরাবী ভাষায় (س) সিন ও (ص) সাদ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: স যেমন (سلم) সালাম, (صلاة) সালাঃ বা সালাত। সালাম’র পরিবর্তে ছালাম, সালাত’র পরিবর্তে ছালাত, (صابر) সাবের’র পরিবর্তে ছাবের লেখা সঠিক হবে না। (ص) সাদ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: স’র উপর বিশেষ ‘আলামত উল্টো কমা (أ) যোগ করলে পার্থক্য করা সহজ হয়। এভাবে (حديث) ’র বানান হাদীস লেখা হলে ছ কে স’র সাথে মিলিয়ে দেয়া হলো। তাই (ث) হারফকে বাংলায় ছ দিয়ে লেখাই বেশি দদ্ধ হয়।

‘আরাবী হারফ (ح) হ, (ق) ক, (ذ) য, (ظ) য অক্ষরের উপর বিশেষ ‘আলামত উল্টো কমা (أ) যোগ করা হলে উক্ত অক্ষর৲লোর উচ্চারণ করতে সুবিধা হবে। বর্তমান কম্পিউটরের যুগে তা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে (سَعُوديْ) শব্দের বানান লেখা হয় সৌদি; তাহলে পাঁচ হারফ বিশিষ্ট শব্দকে সংক্ষেপ করা হয় উপরন্তু (ع) হারফ বা বর্ণ একেবারে হাযফ বা উহ্য হয়ে যায়। অনেকে সউদী লেখেন যা সৌদি বানান থেকে সঠিক। তবে স‘য়ূদী বা সা‘য়ূদী বানান বেশি দদ্ধ কারণ নিম্নরংপ:

س = স, আর সিনের উপর ফাতহাঃ বা জবর থাকায় হবেঃ সা। আসলে সিনের উপর দাম্মাঃ বা পেশ ছিল কিন্তু যাদের নাম তারা সে ভাকে লেখে না। নামের ব্যাপর তাদেরে মর্জি মতো হবে।

ع = য়, আর আইনের উপর দাম্মাঃ বা পেশ থাকায় হবে: ‘য়ু + ওয়াও = ‘য়ূ।

د = দ, আর দালের নিচে কাসরাঃ বা জের থাকায়: দি + ইয়া = দী।

তাই (سَعُودي) শব্দের বানান লেখা উচিত: সা‘য়ূদী তবে উচ্চারণ হবে স‘য়ূদী।

এ ধরনের ভাষা বিজ্ঞানসম্মত বানান দেখে যারা চমকে উঠেছেন বা বেজার হচ্ছেন তাদের অবগতির জন্য এ ধরনের চাক্ষুস প্রমাণ দেখাতে হলো। আশা করি ব্যাপারটা নিয়ে তারা ফিকির করবেন।

BwZ
webxZ †jLK

‘আরাবী হারফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

أ	–	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ	ط	–	Z
ب	–	ব	ظ	–	জ
ت	–	ত	ع	–	‘অ, ‘য়, ‘ই, ‘উ
ث	–	ছ	غ	–	গ
ج	–	জ	ف	–	ফ
ح	–	ɳ	ق	-	K
خ	–	খ	ك	–	ক
د	–	দ	ل	–	ল
ذ	–	য	م	–	ম
ر	–	র	ن	–	ন
ز	–	য	و	–	ও, এ, উ
س	–	স	ه	–	হ
ش	–	শ	ي	–	(ই) য়
ص	–	m			
ض	–	`			

যে সব হারফ মোটা বা বোল্ড করা করা আছে তা তাফখীম (মোটা) বা বিশেষভাবে পড়তে হয় এবং যে সব হারফের নিচে দাগ আছে তা তাখফীফ (পাতলা) অথবা বিশেষ কায়দায় পড়তে হয়।

সবিনয় নিবেদন

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلـي آلـه وأصحـابـه أجمعين. أما بعـد...

ইসলামী বিষয়ে বই লেখার মনোবাসনা থাকলেও এত আগে বই লেখার কথা ভাবি নি। ৭০'র দশকের শেষের দিকে স'য়ূদী 'আরবের মাটিতে পা ঠেকাতেই আমার সাবেক নাম (খায়রুল বাশার)'র কারণে প্রথম চোট খেলাম। পরবতীকালে এ নামের কারণে এখানে আমাকে নিদরুণভাবে নাজেহাল হতে হয়েছিল। তাই 'নামকরণে ইসলামী পদ্ধতি' বইটি লেখতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তা ৮০'র দশকের মাঝামাঝি প্রকাশ হলে লেখক হিসাবে আমার পরিচয় হয়; এটা একান্তই আকস্মিক। সাদাকাঃ জ্যারিয়াঃ (প্রবাহমান পূর্ণকর্ম), কাওমের খেদমত ও পাঠকদের প্রচ্ছন্ন প্রশংসা লেখক জীবনের চরম পুরস্কাররূপে স্বীকৃত। সে অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আর অপ্রত্যাশিতভাবেই এ বইয়ের ইংরেজী ও উর্দু সংস্করণ যখন বাজারে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেল তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকল অনুরক্ত পাঠক পাঠিকাদের চিঠির পর চিঠি। বইয়ের সূত্র ধরেই পরিচয ঘটল সা'য়ূদী বহু গণ্যমান্য বক্তিদেও সাথে। বহু দর্গম স্থানে প্রবেশাধিকার ঘটল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ ডক্টর মুহাম্মদ 'আবদুহ ইয়ামানীর সাথে (প্রাক্তন তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী, বর্তমানে ইকরা কল্যাণমূলক সংস্থান সভাপতি)। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় Islamic Education সিরিজের ৮টা বই লিখলাম এবং সে বইগুলো প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই সা'য়ূদী 'আরবের কিছু International School এ তা পাঠ্যবই হিসাবে গৃহীত হলো। ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে বোম্বাইয়ে কয়েকটা মুসলিম স্কুলে তা দেয়া মাত্রই পাঠ্যবই হিসাবে তারা চালু করল। পৃথিবীর বহু দেশ থেকেও বইগুলোর তলব আসতে থাকল এবং পাঠ্যবই হিসাবে গৃহীত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই সায়ূদী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বইগুলো অনুমোদিত হলো। এবং পরে আরও বইয়ের সাথে তুলনা করে তারা দেখলেন যে আমার বইগুলোই সব দিক থেকে উপযোগী শিক্ষামুলক বই। ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ ওয়াশ শুক্‌র। এ অবস্থায় আর নিজকে লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। তেজারতের মায়াবী আকর্ষণ ত্যাগ করে ফিরতে হলে 'ইলমের প্রশান্ত ভুবনে।

আমি সাহিত্যিক নই, 'আলেমও নই। কল্পনাশক্তির যে প্রাচুর্য সাহিত্যের সর্বপ্রধান অবলম্বন আমার মধ্যে তার বাষ্পমাত্রও নেই। মাওলানা/মৌলভী হওয়ার জন্য নেই মাদ্রাসার প্রথাগত লেবেল। এ জন্যই ইসলামের উপর কোন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখতে দ্বিধান্বিত ছিলাম কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-জন এবং হিতৈষীগণ পরামর্শ দিলেন থামা চলবে না; লেখা অব্যাহত রাখতে হবে।

চরৈবতী অর্থাৎ এগিয়ে চলার প্রেরণা জুগাতে থাকলেন তারা। প্রবীণদের একজন জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে উপদেশ দিলেন:

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে যে হিত সাধন করে
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পার করি কুপ পয়ঃ১ প্রায় তৃষ্ণা শান্ত হয়
বারিধি২ কি পিপাসা নিবারে।

ইসলামের 'আকীদাঃ 'আমল ও আখলাক পরিত্যাগকারী দেউলিয়া বিশ্ব-মুসলিম সমাজকে সঠিক ইসলামী রসদ জোগাতে পারব কিনা জানিনা; কিন্তু তৃষিত মুসলিমদের সুশীতল কূপ পয়ঃ দিয়ে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করে চলব। আশা করি এতে বহু মুসলিমের তৃষ্ণা দূর হবে - ইন-শ্যা আল্লাহ। সৎকাজে মানুসকে আদেশ এবং মন্দকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই; কোন মুসলিমেরই সে দায়িত্ব এড়ানোর উপায় নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾
(آل عمران — ١١٠)

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাঃ (জাতি) মানবকুলের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভাব করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে আর মন্দকাজে নিষেধ করবে।

(সূরাঃ আলে-'ইমরান, আয়াঃ ১১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَان)) (مسلم و غيره)

তোমাদেরর মধ্যে কেউ মন্দকাজ দেখলে হাতের দ্বারা তা পরিবর্তন করবে, তা করতে সমর্থ না হলে মুখের দ্বারা তা পরিবর্তন করবে, তাও করতে সমর্থ না হলে হৃদয়ে (সেটাকে মন্দ জানবে) এবং এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। ৩

হাতের দ্বারা বা মুখের দ্বারা মন্দ কাজের পরিবর্তন ও সংশোধন প্রত্যেক মুসলিমের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবং সে কর্তব্য পালনের জন্য নিয়মমাফিক 'আলেম হতেই হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

---

১. কূপ কুঁয়া/ইঁদারা; পয়ঃ পানি/জল। কূঁপ পয়ঃ অর্থাৎ কুঁয়োর পানি।
২. বারিধি-সমুদ্র।
৩. মুসলিম (আল-ঈমান) নং ৪৯; ইবন মাজাঃ (আল-ফিতান) নং ৪০১৩;
৪. আহমদ (মুসনাদ) নং ১০৬৫১, ১১০৩৪, ১১০৯০, ১১৪৪২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে এজন্য সোল এজেন্সী দিয়ে যান নি; বরং বলেছেন:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة...)) (رواه البخاري و غيره)

আমার তরফ থেকে একটা আয়াত (হুকুম) হলেও (জানলে) তা প্রচার করো। ১

নামকরণে ইসলামী পদ্ধতি বইটি লেখার তাগিদে বিভিন্ন বই পড়ে যা জেনেছি, এখানকার ‘উলামার কাছে যা শুনেছি, পাক-ভারত উপমহাদেশের অনেক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের যে মতামত নিয়েছি এবং নিজেও যা বুঝেছি - তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের নামই ইসলামের উসূল মুতাবেক হয় না। শুধু মাত্র নামের ক্ষেত্রেই নয় - ইসলামী ‘আকীদাঃ উসূল ও ‘আমলের ক্ষেত্রেও বরাবরই বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে। প্রচলিত/লৌকিক ইসলাম (Popular Islam) কে লোক প্রকৃত ইসলাম (Real Islan) মনে করে। আর এটাই স্বাভাবিক কেননা প্রত্যেকের যা আছে তাই নিয়ে তার মাতোয়ারা। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি ও চিরন্তন বৈশিষ্টের কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন:

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾ (المؤمنون- ٥٣)

প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়েই তারা আনন্দিত।

(সূরাঃ আল-মু’মিনূন, আয়াঃ ৫৩)

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়: ইসলামী প্রেরণায় শক্তিমান হয়ে অশিক্ষিত, অনুন্নত, বেদুইন ‘আরবগণ জয় করল তখনকার দিনের শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য এবং বাইজেনটিয়াম (রোম) সাম্রাজের অনেক দেশ। পরবর্তীকালে ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। সে সব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো; ইসলামী শাসন কায়েম হলো। সেখানকার প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি, রসম-রেওয়াজ ও সংস্কারের সাথে ইসলামের সংঘাত শুরু হলো। ইসলামকে মুকাবেলা করতে হয়েছে প্রাচীন সভ্যতা, প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার সাথে। কখনও সে সংঘাত হয়েছে প্রকাশ্যে কখনো ছদ্মবেশে কখনও আবেগে। অ-ইসলামী সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির সংঘাতের পার্শ-প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। এর মধ্যে তিনটি অ-ইসলামী তিনটি বিষয়ই প্রধান: গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ, ভারতীয় আধ্যত্মবাদ ও অতিন্দ্রীয়বাদ এবং কুফরী প্রথা ও অ-ইসলামী সংস্কৃতি।

---

১. আল-বুখারী (আহাদীছুল আম্বীয়া) নং ৩২০২; আত-তিরমিযী (আল-‘ইলম) নং ২৫৯৩; আহমাদ (সুনান কাছীরীন মিন...) নং ৬১৯৮, ৬৫৯৪, ৬৭১১; আদ-দারেমী (মুকাদ্দিমাঃ) নং ৪৫১।

c_g chvq:

উমাইয়াঃ যুগে ইসলামী সাম্রাজ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে গ্রীক-রোম আলেকজান্দিয়ার জ্ঞান ভান্ডার তারা আত্মস্থ করল। পরবর্তী কালে বাগদাদে দারুল হিকমা* প্রতিষ্ঠিত হলো। যার ফলে বহু বিদেশী শাস্ত্র বা গ্রন্থ 'আরাবীতে তর্জমাঃ হয়েছিল্ তখনকার বহু শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলিম গ্রীক-দর্শন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়ল যেমন বিগত শতাব্দীতে অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি কমিউনিস্ট দর্শনকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছিল। কিছুদিন পরেই তা আস্তাঁকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। 'আব্বাসী যুগের প্রারম্ভে শারী'য়তকে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণের হিড়িক পড়ে যায়। শারী'য়তের উসূলের সাথে গ্রীক-দর্শনের সংঘাতে জন্ম নিল মু'য়তাযিলাঃ দর্শন বা (Rationg Philosophy)। দর্শনশাস্ত্রের Dialectic Process বা দ্বান্দিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যঅয় এ পর্যায়কে বলা হয় Anti-Thesis. যার মোদ্দা কথা: দুটো পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘাতে এক নতুন ভাবের জন্ম হয় যা দু-ভাবেরই সমন্বিত রূপ। মু'য়তাযিলা পদ্ধতি ছিল শারী'য়তে ও ফালসফা বা দর্শনের পরস্পর বিরোধী ভাবের সাথে এক অসম মিলনের প্রয়াস। সে জোয়ারের সয়লাবে কুরআন, হাদীছ ও ফিক্হার প্রভাব সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যায়; কেননা মু'য়তাযিলারা ছিল সে যুগেরর সেরা বুদ্বিজীবি এবং যুক্তিবাদী উপরন্তু রাজশক্তি সমর্থিত। খলীফাঃ মা'মূনের দরবারে মু'য়তাযিলাঃ স্বীকৃতি পেল। অধিকাংশ লোকই তাকে স্বাগত জানাল কেননা:

الناس على دين ملوكهم

মানুষ বাদশাহদের ধর্মকে অনুসরণ করে।

মু'য়তাযিলাগণ তাদের দর্শন বা যুক্তির খাতিরে কুরআনকে সৃষ্টির পর্যায়ে টেনে আনল। তারা দাবী করল কুরআন মাখলুক/সৃষ্ট। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং মু'য়তাযিলাঃ দর্শনের সব যুক্তিকে শারী'য়তের দলীল দ্বারা খন্ডন করলেন। তাই তাকে রাজরোষে পতিত হতে হলো এবং এ কারণেই তাকে প্রাণ দিতে হলো।

---

* `vi"j wnKgv: এই তথাকথিত দারুল 'ইলম/জ্ঞানগৃহ বা 'ইলমখানা থেকেই আব্বাসী যুগে বহু বিদেশী পুস্তকের তর্জমাঃ হয়েছিল। ফলে তথাকথিত বহু মুসলিম চিন্তাবিদেরা গ্রীক দর্শন ও ভারতীয় আধ্যাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং ধর্মকে দর্শনের মাপকাঠিতে বিছার বিশ্লেষণের প্রবণতা প্রাধান্য পায়। বিভিন্ন ধরণের মতবাদ: মু'য়তাযিলাঃ, আশাা'য়েরাঃ, 'ইলম কালাম, এবং মানতেকের বন্যা বয়ে যায়, ফলে সয়লাব হয়ে যায় কুরআন, হাদীছ এবং ফিকহার প্রভাব। এমনকি কুরআনকে বলা হয় মাখলূক/সৃষ্ট, আল্লাহর বাণী নয়। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালকে এর বিরোধীতা করার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল। দারুল হিকমার ফিৎনা সে যুগে ছিল ভয়াবহ। সে প্রভাব থেকে এখনও মুসলিম সমাজ পুরাপুরি রেহাই পায় নি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যু বিফলে গেল না। পরবর্তী কালে মু'য়তাযিলাঃ পরিশুদ্ধ হয়ে আশা'য়েরাঃ দর্শনে রূপান্তরিত হলো। যার মধ্যে মু'য়তাযিলার কিছু বীজানু বাকী রয়ে গেল।

আর এ মতই পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। শারী'য়তপন্থী চার মাযহাব এবং সালাফীপন্থীরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও পরবর্তীকালে আশা'য়েরাঃ মতবাদ বহু মুসলিম দেশে গৃহীত হলো। মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধচারী আহলেহাদীছ বা সালাফীপন্থী এবং হাম্বলীদের কাছে আশা'য়েরাঃ কখনই গ্রহণযোগ্য হয় নি। হানাফী ও শাফে'য়ী মাযহাবের অনেকের কাছে তা গৃহীত হয়েছে। বলা হয় আশা'য়েরাঃ আকীদাঃ আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়ার নিকটতম প্রতিবেশী। আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের কিছু ব্যাপারে তাদের সাথে পার্থক্য থাকলেও বাকী বিষয়ে তারা আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়ার অনুসারী।

অতি সংক্ষেপে: ইউরোপীয় দর্শনের সাথে শারী'য়তের সংঘাতে মুসলিমদের মধ্যে নতুন তাত্ত্বিক গোষ্ঠির উদ্ভব হয় যা দার্শনিক পরিভাষায় বলা চলে ঝুহঃযবংরং. 'ইলমুল কালাম, মানতেক ও ফালসাফা বা দর্শনের বিচার পদ্ধতি এবং যক্তির উপর নির্ভরশীল যা পশ্চিমা দর্শনের দ্বারাই প্রভাবিত। মানতেক ও ফালসফার দাপট এখনও কমে নি।

wØZxq chvq:

'আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছিল্ পাক-ভারত উপ-মহাদেশের শিরক-জমীনের প্রতিকূল পরিবেষে তাবে'য়ী বা তাবে'য়ী 'আরবগণ তাওহীদের বীজ রোপন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তার সঠিক পরিচর্যা হয় নি। আর যারা তা করেছিল তা 'আরব নয় তুকী বা তুর্কো-আফগাণ। তারা ছিল ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা বা ট্রাইবের দল; ইসলাম ধর্মে সদ্য দীক্ষিত। যারা তাদের উপজাতিয় সংস্কৃতির উপর ইসলামী প্রভাবে কিছুটা 'আরবীয় প্রলেপ লাগিয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত ইসলাম ও 'আরব সংস্কৃতিকে তারা আত্মস্থ করতে পারেনি। এ অবস্থা বেশি দিন বজায় রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ক্রমশঃ তারা ভারতীয় জীবন ধারার সাথে নিজেদেরকে খাঁপ খাইয়ে নিয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং শাসনকার্যের তাগিদে তাদেরকে হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। রাজ্য জয়, শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদমান মুসলিম শাসকদেরকে সানন্ত হিন্দু রাজা বা জমিদারদের উপর নির্ভর করতে হতো। আর্থিক প্রয়োজনে হিন্দু বণিক বা মহাজন শ্রেণীর দারস্থ হতে হতো। ব্যবহারিক জীবনে সহ-অবস্থানটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল; ধর্মটা গৌণ। মুসলিম বাদশাহগণ ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেননি। অধিকাংশ লোকের ইসলাম গ্রহণের পিছনে কোন জবরদস্তি ছিল না। প্রচলিত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, উচ্চবর্ণের উৎপীড়ন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাত

ইত্যাদি কারণে বহু লোক ইসলাম কবুল করেছিল। উপরন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্যবাদ ও শাসকধর্মের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদে জর্জরিত হিন্দু সমাজের অধিকারহীন বহু হিন্দু ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

ইসলাম কবুলের এই প্রক্রিয়াকে মুসলিম শাসকগণ গতিশীল করতে পারেননি। ইসলাম নিজ গুণেই বর্দ্ধিত হয়েছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে 'উলামা ও সূফী-দরবেশদের ও যথেষ্ঠ অবদান ছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের ইহিহাসে মুসলিম শাসকদের তেমন কোন বিশেষ ভুমিকা নেই। যাহোক ভারতবর্ষে মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বদৌলতেই অনেক 'আরব পরিব্রাজক ভারতবর্ষে হাজির হন। ভারতীয়দের বিশ্বাসের অদ্বৈতবাদ, আধ্যাত্ববাদ, অতিন্দ্রীয়বাদ, মরমীবাদ ইত্যাদি বাবধারা অনেককে আকৃষ্ট করে। 'আরবদের কাছে ভারতীয় দর্শন অভিনব, আকর্ষণীয় ও চমকদার মনে হয়েছিল। আর এ ভাবকে তারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাগদাদে। মানসূর আল-হাল্লাজ এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্যেখযোগ্য। বেশ কিছু কাল সে কাঠিয়েছিল রহস্যময় ভারতবর্ষে। বাগদাদে ফিরে সে প্রচার শুরু করল যে আনাল হাক অর্থাৎ আমি হাক বা আল্লাহ যা প্রকৃতপক্ষে অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার আত্মাই ব্রহ্ম, সর্বং খলিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজমান১ ইত্যাদি ভাবেরই প্রতিধ্বনি। হাল্লাজের বিশ্বাস হলো সকলই আল্লাময়। খালেক (স্রষ্ট) ও মাখলূখ (সৃষ্ট) এক ও অভিন্ন। যা সৃষ্ট তাই-ই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টির অংশ বিশেষ। সে অর্থে আল্লাহ ও হাল্লাজের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। সে নিজে আল্লাহ থেকে অভিন্ন। তার অপর বিখ্যাত উক্তিঃ

ভালবাসার বস্তু সে তো আমি
আমি আমারই প্রেমাস্পদ,
আমাদের দেহ দুই কিন্তু আত্মা এক।
যদি তুমি দেখ আমাকে তো দেখবে তাঁকেই,
এবং যদি তাঁকে দেখ তবে দেখবে উভয়কেই। ২

"আমি মানসূর নই, আমাকে মানুষরূপে দেখ না, আমাকে সত্যের সাথে একত্রিত ছাড়া অন্য পথে দেখ না। বরং আমিই আল্লাহ। আমিই আল্লাহ। আমিই আল্লাহ। আমি মান-মর্জাদা, প্রশংসা-নিন্দা, আশা-আকাঙ্খা, ভয় ও ভীতি ইত্যাদি হতে বহু দুরে। আমার (আল্লাহর) গোপন রহস্য ভান্ডার আমরার শরীরে এসছে। আমার চোখের গোাপন রহস্য অীতন্দ্রীয়বাদের অমোঘ নিয়মে শিষে গেছে।"৩

---

১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ (যজু), (১।৪।১০), ...য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স উদং সর্বং ভবতি...। (২।৫।১৯); ৪।৪।৫)। ছানেদাগ্য উপষিদ, (সাম)। শ্বেতাশ্বতর উপনিয়দ (৬ (৬!১১) সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরত্মা।

২. সূফী দর্শন, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯: ডঃ ফকীর আবদুর রশিদ। প্রাগ্রেসিব বুক কর্ণার ঢাকা।

৩. ইসলামী জগৎ ও সূফীসমাজ, পৃষ্ঠা - ৩৫৯: ডঃ 'ওসমান গণী। মল্লিক ব্রাদাস, কলিকাতা।

মানসূর হাল্লাজের এ দর্শন শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শনেরই কার্বন কপি যিনি নিজেকে অহং শিবোহহম বা আমিই সেই শিব-১ বলে ঘোষণা করেছিলেন। অদ্বৈতবাদী দর্শনের মূল কথা হলো: পরমাত্মা ও জীবত্মা এক ও অভিন্ন অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ এক। জীব ও জড় ঈশ্বর হতে ভিন্ন নয় কারণ এরা তাঁরই উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অন্যদিকে এদের পরস্পরের পার্থক্যও অস্বীকার করা যায় না; যেহেতু বেদান্তেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ পরমব্রহ্মের তিনটি বিভিন্ন রূপ। "...আমরা বিশ্বব্রহ্মান্ডে যে বহু রূপ দেখিতেছি, তাহা সবই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি।"

গীতায় বলা হয়েছে: "জীব হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ্য। একবিন্দু সমুদ্রের জল যেমন গুণগতভাবে সমস্ত সমুদ্রের জল থেকে অভিন্ন, এক কণা সোনাও যেমন সোনা, ঠিক তেমনই জীব পরমা নিয়ন্তা, ঈশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে ভগবানের সমস্ত গুণই তার অনু পরমাণুতে বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রতিটি জীবকেই ক্ষুদ্র ঈশ্বর বলা চলে।"...৩

ভারতীয় অদ্বৈতবাদের ভাবশিষ্য মানসূর আল-হাল্লাজ ইসলামী আইনে মুরতাদ বা জঘন্যতম কাফের হিসাবে ঘোষিত হয় এবং তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তার প্রাণদন্ডের তার দর্শন আকর্ষণীয় হলো এবং সে কিছু লোককে মোহিত করল। পরবর্তীকালে তার প্রতিধ্বনি করে বায়েজীদ বোস্তামী ঘোষনা করল:

সুবহানী মা আ'যামু শানী-অর্থাৎ আমারই পবিত্রতা আমারই কত বড় গৌরব।৪

সে আরও বলে: আমি অতল মহাসমুদ্র অনাদী ও অনন্ত। আমিই আল্লাহর সিংহাসন।

ওমর ইবনুল ফরিদ বলে: আনা হিয়া অর্থাৎ আমিই সে। আবু বকর শিবলীর উক্তি: আমিই বলি আর আমিই শুনি। এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউই নেই। ৫

পরবর্তীকালে ওহদাতুল ওজুদ বা সর্ব-আল্লাহবাদ (Pantheist), কখনও সর্বধর আল্লাহবাদ(Pantheist)'র এক পরিপূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ইব্ন 'আরাবীর মাধ্যমে। তার কুখ্যাত উক্তি:

আমিই ঐ নূর যা লা-মাকামে বিদ্যমান ছিল; নিজের আলোকে তখন আমি নিজেই দর্শক ছিলাম। তখন কোন জগত ছিল না; এই আদমের নাম নিশানও ছিল না। আমি নিজের রূপে নিজেই বিভোর ছিলাম। শিরককে ধ্বংস করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আম্বিয়া ও আউলিয়ার সুরতে নিজেকে প্রকাশ করি। আদমের পোশাকে আবৃত ও লুক্কায়িত হয়ে আমি ফেরেশতাগণের সেজদা গ্রহণ করেছিলাম এবং মুহাম্মদ (সাঃ)'র সুরতে আমি নিজেই প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত হয়েছি। আমি বিভিন্ন সময়ে কখনো শীশ (আঃ), কখনো ইউনুস (আঃ), কখনো ইয়াকুব (আঃ). কখনো ইউসুফ (আঃ), আবার কখনো হুদ (আঃ) হয়ে

---

১. শংকরাচার্যকৃত নির্বাণমঞ্জরী (১-৭) শংকরার্যকৃত ব্রহ্মানুচিন্তম (১-২৭)।

২. হিন্দুধর্মের সারতত্ব, পৃষ্ঠা ৭৯; ডঃ দুর্গাদাস বসু, কলকাতা।

৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ- পৃষ্ঠা ১০; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কত্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ: শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ভারত।

৪,৫. সূফী দর্শন, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯: ডঃ ফকীর আবদুর রশিদ। প্রাগ্রেসিভ বুক কর্ণার- ঢাকা।

প্রকাশিত/আবির্ভূত হয়েছি। কারো জন্য আমি আজিকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি আবার কারোর নিকট আমি রোজ হাশরে মজুদ। হে নিয়াজ! প্রকৃতপক্ষে আমি অমর, আমি অনন্ত, অক্ষয় ও অপরিবর্তনশীল কিন্তু সৃষ্টিলীলার লোকচক্ষুর নিকট আমি কতবার মিথ্যা মৃত্যুবরণ করেছি এবং নিজেকে জগতের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এনেছি। আমার মর্ম কে বুঝবে?১

ইবনে আল-'আরাবীর এ উক্তির মধ্যে রয়েছে হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, অদ্বৈতবাদেরই প্রতিধ্বনি।

গীতায় বলা হয়েছে: পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তখনই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান নরহেহে অবতীর্ণ হন।

যদা যদ্য হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি খারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।। ৭।।

অনুবাদ: হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভুত্থান হয়; তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

পরিত্রাণঅয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপণার্ধায় সম্ববামি যুগে যুগে।।

অনুবাদ: সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দৃস্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই। ২

ইসলাম ধর্মের ইলাহ (উপাস্য) আল্লাহ ধরার ধূলিতে সশরীরে অবতীর্ণ হন না বরং সত্য ধর্ম পুনঃপতিষ্ঠার জন্য তিনি রাসূল বা নাবী প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ (الجمعة - ٢)

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন; যে তাদেরকে আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, আর তাদেরকে পবিত্র/পরিশুদ্ধ করে এবং শিক্ষা দেয় (আল্লাহর) কিতাব ও জ্ঞান/সারগর্ভ উক্তি। ইতিপূর্বে তো তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল। (সূরাঃ জুম'য়াঃ, আয়াঃ - ২)

হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ ইসলাম ধর্মের বিপরীত ধারণা। অবতারবাদী হিন্দুগণ তাদের ধর্মে সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে একাকার করতে চায়।

---

১. সূফী দর্শন, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯: ডঃ ফকীর আবদুর রশিদ। প্রাগ্রেসিভ বুক কর্ণার- ঢাকা।

২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ- পৃষ্ঠা ১০; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শী অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ: শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ভারত।

"এ জন্যই শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলিয় গণ্য করেন। হিন্দুরা বৌদ্ধ বা ক্রিশ্চিয়ান না হইয়াও বুদ্ধ ও যিশুর আলেখ্য বা মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।"১ অর্থাৎ যিশুও এক অবতার।

স্বামী বিবেকান্দ বলেন: "যীশুখ্রীষ্ঠ ঈশ্বর ছিলেন। মানবদেহরূপে সগুণ ভগবান। হিন্দুধর্মের এই অবতারবাদ এবং জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ যুগে-যুগে বিভিন্ন রূপে এ ধরার ধুলিতে ঈশ্বরের জন্মগ্রহণ করার মতবাদ ও ইবন আল-'আরাবীর মতবাদ এক ও অভিন্ন। ইবন আল-'আরাবীকে ওহদাতুল ওজুদ বা অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বলা হয়; আর এর প্রতিষ্ঠাতা হলো মানসূর আল-হাল্লাজ। এই অদ্বৈতবাদই সূফীবাদের প্রথম স্তর/সোপান। পরের স্তর হলো হুলুলীয়া বা ফানা-ঈশ্বরের সত্বায় বিলীন। পরের স্তরে বাকা বা নির্বাণ বা ঈশ্বরত্ব লাভ। পরবতী কালে এ ভাবের বিকাশ হয়েছে পারস্যে।

পারস্যের বিখ্যাত কবি জালালুদ্দীন রুমী বলেন:

মানতু শুদম তুমান শুদি মানতুম শুদম তু জাঁশুদি
আঁ কাছকে নাগোয়াদ আজ ইঁ- মান দীগরম তু-দিগরী।

অনুবাদ: আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ হলাম আর তুমি প্রাণ হলে। এরপর যেন কেউ না বলতে পারে-আমি একজন আর তুমি অন্য জন।

তিনি অন্যত্র বলেন:

মরদানে খোদা গর খোদা না বাশাদ,
ওয়া লেকেন আজ খোদা জুদা না বা-শাদ।

অনুবাদ: মানুষকে খোদা বলে, মানুষ খোদা নয়; কিন্তু মানুষ থেকে খোদা জুদা/পৃথকও নয়। ৩

অদ্বৈতবাদের ধারা এখনও বিদ্যমান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ডঃ 'ওসমান গণী বলেন:

দেখতে যদি চাস
আল্লাহ তবে দেখ
একের মাঝে বহু
বহুর মাঝে এক। ৪

এভাবেই হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও ভাবধারার সাথে ইসলামের তাওহীদী 'আকীদার সংঘাতে জন্ম হয়েছে সূফীবাদের যা দু-ধর্মের Anti-thesis পর্যায়।

---

১. হিন্দুধর্মের সারতত্ব, পৃষ্ঠা ৭৯; ডঃ দুর্গাদাস বসু, কলকাতা।
২. বিবেকান্দ রচনাবলী: পৃষ্ঠা ৫৭১
৩. সূফী দর্শন, পৃষ্ঠা ২১৮: ডঃ ফকীর আবদুর রশিদ। প্রাগ্রেসিভ বুক কর্ণার- ঢাকা।
৪. কাব্যকানন, ডঃ ওসমান গণী, কলিকাতা।

এভাবেই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধ নির্বাণবাদের ধারণর উপর 'আরাবী ও ইসলামী লেবাস লেগে ওহদাতুল ওয়ুদ নামে প্রচার হয়েছিল এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। এভাবের উপরই ইসলামী স্ট্যাম্প লেগে পুণরায় ভারতবর্ষে তা ফেরত এসেছিল। আর এ ভাবের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সূফীবাদের সুচনা তরান্বিত হলো তদানিন্তদ ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে সব রকমের অ-ইসলামী ফিরকাঃ আর ফিৎনা-ফাসাদ।
ডঃ ভেঙ্কটরমন সূফীবাদ প্রসঙ্গে বলেনঃ "The sole source of this knowledge is a clear and accurate understanding of the vediv text. "১
সূফীবাদের উদ্ভব সম্পর্কে নানা প্রকার মতবাদ আছেঃ কেউ এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, কেউ বেদান্তের আধ্যাত্মবাদের, কেউ আবার নব্য প্লেটোবাদের। এ 'আরাবী সূফীবাদের সাথে ভারতবর্ষের সাধন পন্থা, আচরণবিধি, নিয়মশৃঙ্খলা ও নীতিশাস্ত্রের সমন্বয় হলো। হিন্দু অতিন্দ্রীয়বাদী সাধকের সাথে সূফীদের ধ্যান-ধারণা ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়ের লক্ষ্য তত্বজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি (মারেফাত), পদ্ধতি (ত্বরীকা), ধ্যান (মুরাকাবাঃ), সংযম (মুজাহিদাঃ)। সূফীবাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলেও তাতে বৌদ্ধ নিবার্ণবাদের বিলীন (ফানা) তত্বের উন্মেষ হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বা মিলিত হওয়া ফানা (বিলীন) এবং এ অবস্থায় অবস্থানই বাকা (নির্বাণ)। সূফী সাধনায় বিশেষ পন্থার সালীক (পথের পথিক) কে সাধনাদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সফর (চলার) ও সুলুক (অভ্যাস) করার জন্য পথ প্রদর্শনকারী গুরু/মুরশিদ বা পীরের সহায়তা আবশ্যক। এই পীর/মুরীদের ধারণা হিন্দু গুরুবাদের। গুরুবাদী সূফীগণ মুরশিদ/পীর বা গুরুকে মনে করে আল্লাহর সাথে সংযোগস্থল। কাজেই গুরু/মুরশিদ বা পীর ঈশ্বরের মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। হিন্দু ধর্মে গুরু শিষ্যের কথা আছে। যিনি সাধনা ও ধর্মের ব্যাপারে শীর্ষস্থানে আছেন তিনিই গুরু পদবাচ্য। আর যারা সেই পথের পথিক ও রস-পিপাসু তারা গুরু আশ্রিত শিষ্য। সূফীবাদেও ঠিক তেমনি পীর/মুরীদ অর্থাৎ গুরু/শিষ্য। সূফীবাদের শেষ সংস্করণ বাউল গানে ধ্বনিত হয়েছে মুরশিদের মাকামঃ

মুরশিদ বিনে কি ধন আছেরে এ জগতে
মুরশিদের চরণসুধা মনে করলে হরে ক্ষুধা
করো না দিলে দ্বিধা। **যেই মুরশিদ সেই খোদা**
বোজ অলিয়ম মুরশেদা
আয়েতে লেখা কুরানেতে। লালন ফকির

---

১. The Vedanta and Modern Thiught – P ৮০

আল্লাহ সম্পকীয় জ্ঞান বা মারেফাতের ভেদ জানার জন্য পীর/মুরশিতদ নির্দেশিত পথ (তরিকা) অনুযায়ী চললে সত্য (হাকিকত)'র সন্ধান পাবে। হিন্দু ধর্মে আরও ব্যাপক অর্থে বলা হয়: "ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আসন।" তুলসীদাস কৃত রামায়ণে উল্লেখ আছে : গুরু ইচ্ছা করলে ব্রাহ্মণের ক্রোধ থেকে শিষ্যকে রক্ষা করতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে জগতে শিষ্যকে রক্ষা করার আর কেউ থাকে না।" ১

ডঃ উরকাহাট গুরু সম্বন্ধে বলেন: In course of the development and as a result of it, devotion to the truth and devotion to the Guru become always synonymous. ২

সূফীবাদে পীর ছাড়া পথ দেখানোর আর কেউ নেই এবং মুক্তি নেই। এভাবে হিন্দু গুরুবাদ পীবাদে রূপ নেয়। আর এই পীরতন্ত্রের প্ররোচনায় শরী'য়তপন্থী 'আলেমদের প্রভাব ক্ষুন্ন হয় এবং কিছু 'আলেমও পীর বনে যান। ভরতবর্ষে ইসলাম প্রচারে সূফী পীরদের তৎপরতা এবং তাদের উপর বিজাতীয় ধর্মের প্রবাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ভাববাদ, নিও প্লেটোনিক দর্শন, নাস্তিক মতবাদ, খৃষ্টীয় সন্ত্রাসবাদ ও অতিন্দ্রীয়বাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও সমন্বিত হয়ে সূফীবাদ এক নতুন সমন্বিতরূপ ধারণ করে। হিন্দু গুরু বা দেবতাদের অলৌকিক কাহিনীর মুকাবেলায় সূফী পীর/মুরশিদের কারামত বা অলৌকিক কান্ড, কাশফ ও ইলহাম যোগ হয়। এবং গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের মতো পীরের কাছে বাইয়াত করা শুরু হয়। ব্রাহ্মণদের শালিগ্রাম ছুঁয়ে শপথ গ্রহণের মতো পীরের পাগড়ী ছুঁয়ে হলফ করা হয়। এবং পীরদের গদ্দিনশীন হওয়া ব্রাহ্মণদের যজমানের মতই। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে। পীরের ছেলেই গদ্দিনশীন হবে। ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মতই মুসলিম সমাজে আশরাফ-আতরাফের চলন হয়। বিয়েশাদী ও অন্যান্য উৎসবে সামাজিকতায় অনেক হিন্দুয়ানী প্রথা ঢুকে পড়ে মুসলিম সমাজে ক্রমে ক্রমে তা মুসলিম কালচারে শামিল হয়ে যায়।

ডঃ ইনামুল হক বলেন : "কালের গতিতে সূফীবাদের সাথে হিন্দু যোগ সাধন ও তন্ত্রচার পদ্ধতির একটা আপোষ মিমাংসা হয়; ফলে সূফীবাদের সাথে বাংলাদেশের ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল।"৩

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন: "বাংলাদেশই ইসলামের সূফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। এই সূফীমতের সাথে বাংলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নেই। সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাংলার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক-সাধন মার্গের সঙ্গে একটি আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"৪

---

২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ- পৃষ্ঠা; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শী অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী।
২. The Vedanta asd Modern Thought –P 80.
৩. সূফী প্রভাব, ডঃ ইনামুল হক - পৃষ্ঠা ৮৩।
৪. জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য: আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়।

এভাবেই ভারতীয় যোগ সাধনা সুফীদের 'আমল, বৌদ্ধদের নির্বাণ -সূফীদের ফানা, হিন্দুদের ধ্যান-সূফীদের মুরাকাবাঃ, হিন্দুদের দর্শন-সূফীদের মুশাহাদাঃ, হিন্দুদের কুলকন্ডলিনী শক্তি-নকশাবন্দী সূফীদের লাতীফাঃ, হিন্দুদের প্রাণায়ম বা জপ-সূফীদের জিকির ও ফিকির, হিন্দুদের আখড়া-সূফীদের খানকাঃ, সংগীত-সামা, মূর্ছা বা ভাবোম্মাদ-হাল, ঈশ্বরের সত্বায় অবস্থান-বাকা, ঈশ্বরের সত্বায় মিলন-হাল, এবং সে অবস্থায় থাকা-ফানা, কীর্তন-হালকায়ে জিকির ইত্যাদি। বৌদ্ধদের মঠ ও হিন্দুদের আখড়া সূফীবাদী পীরদের খানকা নাম ধারণ করে। পরবতীকালে সূফীবাদের সাথে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের মিলন হয়েছিল।

"সূফীদের আশেক ও মাশুক-বৈষ্ণবদের রাধা ও কৃষ্ণ, সূফীদের হিজরান ও ওসাল- বৈষ্ণবদের বিরহ ও মিলন, সূফীদের মায় ও শরাব-বৈষ্ণবদের প্রেম ও প্রীতিচী, ইশক ইলাহী-ভাগবত প্রেম, আশেকে রাসূল-কৃষ্ণ প্রেম ইত্যাদি। "১

দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাগুলো 'আরব মুলুকে পৌঁছুলে তার উপর 'আরাবী-ইসলামী আস্তারুণ লাগিয়ে বা তর্জমাঃ হয়ে পারস্যের পথ বেয়ে ভারত ফেরত এসেছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবিগণের দ্বারাই এ ভাবের চরম বিকাশ হয়েছিল। যা আসলেই ছিল ভারতেরই মাল। তাই ভারতে তা সহজে গৃহীত হয়েছিল; কেননা এ দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পদার্থ একই শুধু পাত্র ও স্থানের পরিবর্তন বা স্থানান্তর। ইসলাম ধর্ম তখন ছিল আনকোরা নতুন ও চমকপ্রদ। সদ্য-দীক্ষিত নয়া মুসলিম সমাজের বহু লোক প্রাচীন ভাব ও বিশ্বাসের মধ্যে থেকে নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছিল। রাসূলের দেশ বা 'আরব ভূমি থেকে আগত যে কোন 'আরাবী ভাব, বিশ্বাস নির্বিচারে গৃহীত হয়েছিল ভক্তিবাদীর দেশ ভারতের মুসলিম সমাজে কারণ সময়টা ছিল উপযুক্ত। উপরন্তু হিন্দু বৌদ্ধদের আপোসহীন সংঘাত, ব্রাহ্মণদের জুলম, জাতিভেদ প্রথার মানবিক অবমাননা, হিন্দু রাজাদের মধ্যে বিরামহী অনৈক্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারতবাসী এক নতুন ধর্ম বা জীবনাদর্শের প্রতীক্ষায় ছিল। ইসলাম ধর্ম সে শূন্যতা পূর্ণ করল। হিন্দুধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের অধিকারহীন, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিল। ভারতের নব-মুসলিম সমাজ 'আরাবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও তাদের মনের পুঞ্জিভূত সংস্কার ও সঞ্চিত বিশ্বাসের মূল-উৎপাটন হয় নি। 'আরব মুলুক থেকে আগত সুফীদের জিকির-ফিকির, তরিকা, 'আমল, ফালসফা ভারতের প্রচলিত পদ্ধতি, পথ-মত, ধ্যান-ধারণার সাথে কোনই অমিল ছিল না। তাই অতি সহজেই তা সকলের কাঝে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। উপরন্তু যারা ইসলাম প্রচার ও প্রসার করেছিলেন তারা সকলেই সূফী সিলসিলায় বিশ্বাসী ছিলেন ফলে সূফীবাদের প্রচার ও প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল। সূফীবাদের ইসলাম আর প্রকৃত ইসলামের মধ্যে অনেক ফারাক।

---

১. রবীন্দ্রনাথ ও ইসলাম; পৃষ্টা ৫৬৬; ডঃ ওসমান গণী।

সূফী প্রবর্তক মানসূর আল-হাল্লাজ, ইবন 'আরাবীর উত্তরসূরী বে-শরা' গায়ক লালন ফকির পরবর্তীকালে বাউল গানের মধ্যে রাসূলকে খোদা বানিয়েছে। খোদা আর রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে নি। তাদের গানে ধ্বনিত অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদেরই প্রতিধ্বনি:

আশিক হইয়া খোদা
মুহাম্মদ করিল পয়দা
প্রেমেরই কারণে প্রভু নিরঞ্জন
আহাদের মধ্যে করিল মিমের মিলন। লালন ফকির।

ইসলাম জগৎ ও সূফী সমাজ৮ গ্রন্থে লালন ভক্ত ডঃ ওসমান গণী উপরোক্ত ভাবের হাকীকত বয়ান করেছেন ঃ "আল্লাহকে বলা হয় আহাদ বা এব, এবং মহনবীজীর (সঃ) নাম আহমাদ, যার অর্থ প্রশংসাকারী। আহাদ ও আহমদ এই দুটো শব্দের মধ্যে কেবল পার্থক্য একটা মীম বা ম। যখন আহমদ শব্দ থেকে 'ম' কে সরিয়ে দেওয়া, তখন থাকে শুধু আহাদ। আবার মহানবীজীর (সঃ)'র নাম মহম্মদ।* যার অর্থ প্রশংসাকারী এ থেকেও 'ম' কে সরিয়ে দিলে থাকে কেবল আহাদ। এবং এই যুক্তিতে বলতে চান, আল্লাহ এবং আহমদ ও মহম্মদ - এর মধ্যে এই যে পর্দা তা কেবল মীম; অর্থাৎ 'ম' এর পর্দা মাত্র। আর কিছু নয়। অতএব আল্লাহ-আহাদ এবং মহম্মদ সবই এক। এই সম্পর্কে ভারতীয় সূফী সারমাদ মনে করেন, "যে তাঁর মহাসত্তায় বন্ধু হতে পেরেছে সে এই বিশ্ব-চরাচর অপেক্ষাও অনেক বড়, এবং মুক্তা হতে অনেক গোপন।" মোল্লারা বলেন: আহম্মদ মিরাজে (আকাশে) গিয়েছিলেন। কিন্তু সারমাদ বলেন, " আকাশ আহম্মদের মধ্যে অবতরন করেছিল।" ১

উপরোক্ত ধারণা সর্বেতোভাবে মিথ্যা এবং কাল্পনিক যার কোন ভিত্তিই নেই। এ ধারণা 'আরাবী ব্যাকরণ বা কাওয়ায়েদসম্মত নয়। বাস্তবসম্মতও নয়। বলা যায় এক উদ্ভট ধারণ। ইসলামী 'আকীদার বিচারে জঘন্যতম শিরক। আহাদ শব্দের রুট (أ ح د)। আর আহমদ ও মুহাম্মদ শব্দের রুট বা ক্রিয়াপদ (ح م د)। এ রুটের আগে আলিফ যোগ হয়ে (أَحْمَدُ) হয়েছে যা 'আরবী ভাষায় ইসমে তাফদীল (ঝাঁঢ়বৎষধঃরাব উবমৎববব) অর্থ অধিক প্রশংসনীয়। আবার এ রুটই (ح م د) যখন বাবে তাফ'য়ীলে ব্যাবহৃত হয় তখন উহার ইসমে মাফ'উল (محمد) হয়। অর্থ অধিক প্রশংসিত। অর্থাৎ হাম্মাদ শব্দের আগে মীম যোগ হয়েছে 'আরাবী গ্রামার অনুযায়ী। আহাদ (আল্লাহ)'র দ্বারা মিলনের প্রয়োজন হয় নি।

---

* মহম্মদ, আহমেদ বানান ভুল Mohammed, Ahmed। শুদ্ধ হলো মুহাম্মদ বা মুহাম্মাদ, আহমদ বা আহমাদ Muhammad, Ahmad।

১. ইসলামী জগৎ ও সূফীসমাজ, পৃষ্টা - ৩৬৩; ডঃ ওসমান গণী

'আরাবী ভাষায় মীম বা ম অক্ষরের ব্যবহার বহু ক্ষেত্রেই হয়। যথা:

১. মীম মাসদার যেমন মুয়াফাকাঃ (الموافقة) অর্থ পরস্পরে ঐক্যমত হওয়া, মুখ্যালাফাঃ (المخالفة) অর্থ পরস্পর বিরোধিতা করা ইত্যাদি।
২. মীম প্রশ্নবোধক যেমন মা ইসমুকা (ما اسمك)অর্থ তোমার নাম কি?
৩. মীম মাফ'উল যেমন মানসূর (منصور)।
৪. মীম যরফে যামান যেমন মারজা'য়া (مرجع) অর্থ প্রত্যাবর্তনের সময়।
৫. মীম যরফে মাকান যেমন মাসজিদ (مسجد) অর্থ সিজদা করার স্থান।

এমনিভাবে সুলাছি মুজাররাদ গাইরে মুলহাক বারুবা'য়ীর বাবগুলোর প্রত্যেক ইসমে ফা'য়েল ও ইসমে মাফ'উলে মীম যুক্ত হয় যেমন:

- বাবে ইফ'য়ালে মুকরিম,মুকরাম।
- বাবে তাফ'য়ীলে মুহাম্মিদ, মুহাম্মাদ।
- বাবে তাফা'উলে মুতাকাব্বিল, মুতাকাব্বাল।
- বাবে মুফা'য়ালাঃ যেমন মুকাাবিল, মুকাাবাল।
- বাবে তাফাা'উল যেমন মুতাফাাখির, মুতাফাাখার।

সুতরাং আহমদ শব্দ থেকে মীম সরিয়ে নিলে বাকী থাকে আহ্‌দ-আহাদ নয় কেননা মূল আরবী শব্দ أَحْمَدُ আহমদ শব্দের হা-এর উপর যজম আছে, তাই হা-এর উপর আকারের উচ্চারণ হতেই পারে না; উপরন্তু (ح) হরফে ইল্লতও নয় যে এ হরফকে কোন ভাবে হেরফের করা যাবে। আর যজম যুক্ত আহ্‌দ শব্দটি অর্থহীন। মুহাম্মদ/ مُحَمَّدٌ শব্দের শুরু থেকে মীম ও মধ্যের ডবল মীম উঠিয়ে নিলে বাকী থাকে হাদ যার অর্থ সীমা,সীমানা, দন্ড, সাজা ইত্যাদি যা কখনও আল্লাহর গুনবাচক নাম হতে পারে না।

যারা মীম'র পর্দার কথা বলে গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা করে তারা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী, নিছক কাল্পনিক এবং গ্রামার-বিরোধী। মীম'র পর্দা নিয়ে বাউলদের যে বিশ্লেষণ তা মনগড়া, ভিত্তিহীন, আজগুবী। তাদের পুরো বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ইসলামী লেবেল লাগিয়ে ইসলামী সমাজে প্রবেশ ঘটিয়েছে।

বাউলরা বেদ-বিধি, শারি'য়তের রীতিনীতি ও বিধানকে ত্যাগ করে রাগের আচার অনুসরণ করে থাকে। তাদের মতে চিরাচরিত অনুষ্ঠানিক ধর্ম প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে সমর্থ নয়। তাদের এ ধারণাকে হিন্দুরা কখনই গ্রহণ করে নি। মুসলিম সমাজেও তা জঘন্যতম কুফর ও শিরক হিসাবে বিবোচিত। তাই বাউল ফকিরকে জাতের বিচারে সম্মুখীন হতে হয়েছিল...।

বাউল কবি লালন বলে:

লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?
লালন কয় জাতের কি রূফ দেখলাম না এ নয়নে।...

বাউল গানের ভামুল্যে ও ছন্দে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে প্রথম সচেতন করেছিলেন বাউল গানের নিজস্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ নিজকে বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। ডক্টর সুধীরবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "তার কোন কোন রচনাকে তিনি এমনকি রবীন্দ্র বাউলের রচনা বলে মেনে নিয়েছেন। অথর্ববেদকে বাউলরা নিজেদের প্রাচীনতম বাণী বলে থাকে। তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াযোগের মিল দেখা যায়।" ১

শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ক্ষিতিমোহন সেন তার বাঙ্গালার বাউল গ্রন্থে লিখেছেন: "মহাভারতে বহু বাউলিয়া তথ্য আছে।... বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপনিষদে, দেহই তোমার দেবালয়। তাহতে যে জীব তিনিই তো শিব।" ২ (এরপর আছে সংস্কৃত শ্লোক)

ডঃ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: "তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর জমিদারির শিলাইদহ পরগণার কাছেই ছিল প্রতিখান লালন ফকিরের স্থান, সেটা ছিল কুষ্টিয়ার নিকট। লালনের জন্ম হিন্দু বংশে। সিরাজ সাঁই নামে একজন মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা নেন ঐ লালন ফকির। লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের ডাকবহনকারী বা পিওন, তার নাম ছিল গগন। সেই গগন বাউলের বাউল গান রবীন্দ্রনাথ তার হিবার্ট (০০০) বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেছিলেন। লালনের সাধনাতে হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মেরই লোক দেখা যায়। তাহার সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়...। এই ধারার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।" ৩

রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই সূফী কলি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে বইও লেখা হয়েছে। ডঃ 'ওসমান গণী রবীন্দ্র ভক্তিতে গদগদ হয়ে তার প্রতি অর্ঘ নিবেদন করেছেন: "কবিগুরু যেন ইসলামেরই একজন মহাপুরুষ ও মহাকবি।"৪

ডঃ সুকুমার সেন বলেন: রবীন্দ্রনাথের আধ্যত্ম ভাবনা তাহার নিজস্ব। তবে এ ভাবনা বারতীয় আধ্যত্ম-ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সে মূলের দুইটি প্রধান শাখা। এক উপনিষদের আনন্দ দর্শন, দুই বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদ... তাই উপনিষদের বানীর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তাহার রচনায় গুঞ্জরিত।" ৫

---

১. দেশ, পৃষ্টা, ৩৬, ১২, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১।

২/৩. বাংলার বাউল, পৃষ্টা ৫৯।

৪. ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্টা ১৬; ডঃ ওসমান গণী।

৫. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় খন্ড, পৃ ১, ১০ ও ১১।

কবি রবিন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেনঃ "অজ্ঞতসারে আমি আমার বৈদিক পূর্বসূরিদের পথই অনসরণ করিয়াছি।" পরের অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তার অদ্বৈতবাদী দর্শনের আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ১

দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ, মরমীবাদ, অতিন্দ্রীয়বাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি সবেরই মূল বৈদিক ধর্ম বা সংস্কৃতি।

সূফীবাদের পুরো ধারণাটাই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ থেকে নকল করা হয়েছে এবং যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রীক দর্শন থেকে এবং বিদ'য়াঃ (বিদ'য়াত) এসেছে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, মাজূসী ও অন্যান্য ধর্ম থেকে।

শারী'য়তপন্থীদের সাথে যুক্তীবাদ, সূফীবাদ ও বিদ'য়াতিদের সাথে সংঘাত চলছে বরার। ইমাম গাজালী এই ধারার সম্বন্বয় করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেই সূফীবাদের বলয়ে ঢুকে পড়েন। গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত ফারাবী, ইব্ন সীনা, ইব্ন রুশদ দার্শনিক ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিতেন। পরবর্তী কালে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমীয়াঃ সূফীবাদ ও ফালসফার এবং অ-ইসলামী চিন্তা-ভাবনার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দর্শনের যুক্তির উপর শারী'য়তের অনশাসনের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি তার বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে অ-ইসলামী প্রমাণ করলেন। সূফীবাদের ধারাকে তিনি তিন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করলেনঃ সূফীবাদ বা তাসাউফ (বৈরাগ্যাবাদ) কে যুহুদ (বৈষয়িক অনাসক্তির)'র সাথে তুলনা করে দেখালেন যুহুদ শারী'য়তসম্মত এবং যারা যাাহেদ ছিলেন তারা হলেন মাশায়েখুল ইসলাম, মাশায়েখুল ইসলাম, মাশায়েখুল কিতাব ও সুন্নাঃ বা অয়েম্মাতুল হুদা (সৎ-পথ অনুসরণকারীদের ইমাম/নেতা) তারা হলেন হাসান বাসরী, মালিক বিন দীনার, সুফইয়ান আস-সাওরী এবং তারা সমসাময়িক ব্যক্তিগণ যারা শারী'য়তের উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবা যুহুদের সাথে তাসাউফের সংমিশ্রন করলেন তারা কুরআন ও সুন্নার বিপরীত কোন 'আমলকে প্রশ্রয় দেননি। তাদের জীবনধারা ছিল শারী'য়ত-সম্মত। এরা হলেন 'আবদুল কাদের জীলানী প্রমুখ (আল মুস্তাকীম আল-আওয়াল) অর্থাৎ সঠিক পথের অগ্রগামী।

তৃতীয় পর্যায়ে তাসাউফপন্থী সূফীগণ শারী'য়তকে অস্বীকার করে ইসলামের মধ্যে গায়রে-ইসলামকী ভাবধারার সংযোজন ঘটায় সেমন ওহদাতুল ওজুদ বা হুলুলীয়াঃ (অদ্বৈতবাদ), ফানা (বিলীন), বাকা (নির্বাণ) ইত্যাদি। এরা হলো মানসূর আল-হাল্লাজ, ইবন আল-'আরাবী প্রমূখ। ইবন তাইমীয়াঃ তার বলিষ্ঠ যুক্তি ও চাক্ষষ প্রমাণের দ্বারা ইবন 'আরাবীর অনুসাবীদের সর্ব প্রকার ভন্ডামী, ভেলকীবাজী এবং অসার ধ্যাণ-ধারণার মুখোশ খুলে দিলেন।

---

১. এ বইয়ের ৬৬ পৃষ্টা দেখুন।

সূফীদের তথাকথিত কারামত* কে তিনি প্রমাণ করলেন যে তা নিছক ভেলকীবাজী যেমন কিছু সূফীদের আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কিছু সূফী এক ধরণের অদাহ্য বা ফায়ার -প্রুফ মলম ব্যবহার করে আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারত। অপামর জনসাধারণ তা কারামত মনে করত। ইবন তাইমীয়াঃ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে গোসল করে তারা আগুনে প্রবেশ করুক। তারা তা অস্বীকার করল ফলে সকলের কাছে তাদের ভেলকীবাজী প্রকাশ হয়ে পড়ল। অনেক মেহনত করে শায়খুল ইসলাম সূফীদের মুখোশ খুলে দিলেন। বহুলোক সূফীবাদ ত্যাগ করে ইসলামে পুনঃপ্রবেশ করল; ফলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো সূফীপন্থী ও বিদ'য়াত পন্থীগণ। তাদের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে ঢুকান হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইব্নে তাইমীয়ার চিন্তা-ভাবনা পরবর্তী যুগে বহু দেশে প্রভাব বিস্তার করে।

ইব্ন তাইমীয়ার অনুকরণে মুজাদ্দিদ শায়খ আহমদ শারহিন্দী সূফীবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। বাযেজীদ বুস্তামী, মানসূর আল-হাল্লাজ ও ইবনুল 'আরাবীদের ওহদাতুল ওজূদের (অদ্বৈদবাতী) চিন্তধারা, তাদের উপলব্দি ও অভিজ্ঞতাকে নিম্মশ্রেণীর তরিকার কুফরীভাব বলে অভিহিত করেন এবং এ ধরণের চিন্তা পোষণ করাকে হারাম ঘোষণা করেন। সূফীদের সামা (সয়গীত), আল্লাহ প্রেম-মূলক গজল ও সংগীত ইত্যাদি অবৈধ ঘোষণা করেন। এবং ওহদাতুল ওজুদ বা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ওহদাতুশ শুহুদ বা দ্বৈতবাদের ধারণা প্রচার করেন। শুহুদীয়া মতবাদ হলোঃ সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা পৃথক এবং ভিন্ন দুই সত্ত্বা। স্রষ্টা বা আল্লাহ অসীম, অনন্ত ও অখন্ড সত্তা যা সর্ব প্রকার ধরন, সম্বন্ধ, বাহ্যিকতা, আত্মিকতা, উদ্বাবন, হৃদয়ঙ্গম, ব্যাখা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষকরণ, যুক্তি, চিন্তা ও ধারণার অতীত। ঐশী প্রত্যাদেশ অর্থাৎ ওহীর মাধ্যম ব্যতীত তা জানা সম্ভব নয় বরং দাসত্বই হচ্ছে একটা পন্থা মাত্র। দাসত্ব বা 'ইবাদতের জন্যই আল্লাহ জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এজন্য আল্লাহর নৈকট্যের শেষ মোকাম দাসত্ব। বান্দা সব সময়ই আল্লাহর দিকে চেয়ে তাঁরই অনুগ্রহ ও রহমত লাভের জন্য দাসত্বের মোকামে দন্ডায়মান। আল্লাহর সাথে যে কখনও ওয়াসিল বা মিলিত হতে পারবে না। মোট কথাঃ আল্লাহকে দুরে রেখে অদৃশ্যে তার উপর ঈমার রাখা, বান্দা হিসাবে তার দাসত্ব করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা এবং মৃত্যুর পর পরকালে তাঁর দর্শন করে মহাতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করাই শুহুদীয়া পন্থীদের মূল লক্ষ্য।

---

* আল্লাহর নাবী, রাসূল ও ওলীদের কারামত হক বা সত্য এবং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংগ কিন্তু একদল সূফী বা ফকীর কারামতের নামে যে ভেলকীবাজী করে তা পরিত্যজ্য। জ্বীন বশীকরনের মাধ্যমে বা যাদুর দ্বারা তারা এসব অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কান্ড ঘটিয়ে থাকে। শারীয়ত-অজ্ঞ মানুষের তা কারামত মনে হয়। মু'মিনরা আল্লাহর ওলী আর ভন্ডরা শায়তানের ওলী।

পরবর্তীকালে শাহ ওয়ালীইল্লাহ দেহলভী ভারতের ইসলামী আন্দোলনের গোড়া পত্তন করলেন। সূফীবাদকে তিনি অস্বীকার করলেন; কিন্তু তার প্রবাব মুক্ত হতে পারেন নি।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর পরবর্তী সূফীগণ ছিলেন মিলনপন্থী বা সম্বন্বয়পন্থী। এদের মধ্যে হলেন: ফখরদ্দীন ফখরে জাঁহা, কিরামত আলী জৌনপুরী, শাহ সাদিক আলী চিশতীপ্রমুখ। এরপর থেকে শুধুমাত্র একচেটিয়া ওজুদীয়াঃ বা একচেটিয়া শুহুদীয়াঃ মনোভাব সূফী জগতে গৃহীত হয়নি বরং এ দুয়ের মিলিত রূপই তাসাউফের প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে গৃহীত হয়েছে যেমন হিন্দুদের অদ্বৈতবাদ (ওহদাতুল ওজুদ) এবং দ্বৈতবাদ (ওহদাতুশ শুহুদ) মিলিত হয়ে একাকার হয়েছিল।

এভাবে দেখা গেছে ভারতে বড় বড় 'আলেম ও চিন্তাবিদগণ কোনভাবেই সূফীবাদের সর্বগ্রাসী বিষাক্ত ছোবল এড়াতে পারেন নি। ভারতে স্বনামধন্য বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠানে 'উলামা ও মাশায়েখের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য কিন্তু অধিকাংশ 'উলামার মধ্যে পীরপরস্তী, কারামাত, বাইয়াতের সিলসিলা জারী রয়েছে। তারা ইসলামের প্রবক্তা হয়েও গায়ের ইসলামী 'আকীদাঃ ও রসম- রেওয়াজের প্রভাবমুক্ত হতে পারে নি। নির্ভেজাল ইসলামী 'আকীদার অনুসরণ এবং সঠিক 'আমল করতে তারা সমর্থ হন নি। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা মুসলিমগণ যা করছেন তা প্রকৃত ইসলাম নয় ইল্লা মা শা আল্লাহ তবে যাদেরকে আল্লাহ তাওফীক দান করেছেন। আর যারা তা করছেন তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ইদানিংকালে নাজদের শায়খ মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল ওহাব পুনর্জীবিত করেন ইব্ন তাইমীয়ার বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনাকে। তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন আল-সায়ূদ বংশের বাদশাহ 'আব্দুল আযীয। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যাযীরাতুল 'আরবে বা 'আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রকার অ-ইসলামী চিন্তা-ভাবনা, জাহেলী ধ্যান-ধারণা নির্মূল হলো। নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো। সব কিছু তরক করে শারী'য়ত প্রাধাণ্য পেলো। আর এহেন সন্ধিক্ষণে 'আরব দেশে আবিস্কৃত হলো তরল সোনা ঃ পেট্রোল। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে এলা জীবিকার সন্ধানে। 'আরবদের সাথে 'আজমীদের (অনা-'আরব) সংস্পর্শের সুযোগ ও সময় হলো যথেষ্ট। এই দীর্ঘমেয়াদী সহ-অবস্থানের ফলে এবং আধুনিক যুগের যানবাহনের সুযোগে অনা-'আরব মুসলিম ও 'আরবদের পরস্পরকে জানার সুযোগ হলো। ফলে অনা-'আরব মুসলিমগণ তাদের প্রচলিত ইসলামের মূল্যায়ন করতে সমর্থ হলো। উপলব্ধি হলো যে ইসলামের নামে যা প্রচলিত তা সবটাই ইসলামী নয়। ফলে নতুনভাবে ইসলামের দিগন্ত হলো বিস্তৃত। উপরন্তু বহু ইসলামী বইয়ের তর্জমাঃ শিক্ষিত মুসলিমদের জন্য প্রকৃত ইসলাম ইপলব্ধির সহায়ক হচ্ছে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে সাতশো বছরের মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসী। কুরআন, হাদীছ এবং ইসলামী বইয়ের তর্জমাঃ হয়েছে ফারসীতেই।

তাই এ ভাষার অবদান ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাক-ভারত উপমহাদেশে এ ভাষার প্রভাব গভীর। ফলে 'আরবী শব্দের পরিভাষা ফারসীতে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা সঠিক ও যথার্থ হয়নি যেমন খোদা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি শব্দগুলোঅ ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে দেখা যায় এসব শব্দগুলো 'আরাবী শব্দের সঠিক ও যথার্থ প্রতিশব্দ নয়। 'আরাবী শব্দগুলো অত্যন্ত অর্থসম্পন্ন ও ভাবগম্ভীর। এখন এগুলোর সঠিক মূল্যায়নের সময় এসেছে। বর্তমানে 'আরবদের সাথে যোগাযোগ ও দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের ফলেই এধরণের চিন্ত-ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে।

এই পারস্য দেশে সূফীবাদের চরম বিকাশ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র আগে ও পরে পৃথিবীতে দুটো শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য। আজকের ভায়ায় Superpower। 'আরবদের হাতে পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয়ের ফলে পারসিকদের মধ্যে নৈরাশ্য, গ্লানি আর হীনমন্যতা জন্ম নিয়েছিল। যার ফলে সেখানে কঠোর সংযম ও মরমীবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে সেখানে এক ধরণের বৈরাগ্যবাদ, আধ্যত্ববাদ, মরমীবাদ বা অতিন্দ্রীয়াবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বহু বিখ্যাত সূফীগণ। উপরন্তু দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীকে ফাসী ভাষার স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ যুগে পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেন মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী, ফখরদ্দীন ইরাকী, শেখ সা'দী, শামসুদ্দীন হাফেজ সিরাজী, আব্দুল করীম জিলী, ফরীদ উদ্দীন আত্তার এবঙ ফিরদৌসী প্রমুখ জগত বিখ্যাত কবিগণ। এসব মরমী কবিদের ভাবের ব্যঞ্জনা, ভাষার ছন্দ ও অলংকারের লালিত্য পারস্য ও ভারতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হাফিজ ও শেখ সা'দীর রুবাইয়ত মুখস্ত ছিল না এমন 'আলেম তখন বিরল ছিল্ কিছুদির আগেও আমাদের দেশে 'আলেমগণ হাফিজের শে'য়র শা'য়েরী ও শেখ সা'দীর বায়ত উদ্ধৃতি না করলে ওয়াজেন মাহফিল জমাতে পারতেন না। হাফিজের মসনবী কে বলা হতো মসনবী শরীফ। এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি ছয় দপ্তরে ত্রিশ হাজার শ্লোকে গ্রথিত। এই গ্রন্থ রচনায় চল্লিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছিল। ভাবের গভীরতার, সূফী তত্ত্বের প্রতিবেদুনে এবং সত্যের স্বরূপ সন্ধানে মসনবী গ্রন্থ অপূর্ব সৃষ্টি। তাই কবি জামীর ভাষায়ঃ

মসনবীয়ে হাস্ত কুরআন দর জবানে পাহলবী,
মসনবীদেয় মৌলুবীয়ে মানুবী।

অর্থাৎ মসনবী পাহলবী/পারস্য ভাষায় কুরআন স্বরূপ।

পারসিকগণ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও পারসী সভ্যতার গৌরব, উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা তাদের মন থেকে মুছে যায় নি। তাই মসনবীকে কুরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করে পারস্যের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং 'আব্বাসী শাসনামলে 'আব্বাসী শাসকদের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায়

যে দেশে সঠিক ইসলাম বিকশিত হয় নি। অধিকাংশ লোকই শী'য়া মতকে গ্রহণ করেছে এবং সূফীবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মানুষকে হিদায়তে করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে তাঁর রাসূল ও নাবী পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নাবী ও রাসূল তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। নাবী ও রাসূলের মৃত্যুর পর মানুষ তাওহীদ ত্যাগ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছে। পরে নাবী বা রাসূল এসে তা সংশোধন করেছেন। যুগ যুগ ধরে চলেছে তাওহীদের সাথে শিরকের আপোষহীন সংঘাত। পরিবেশ, পরিমন্ডল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন দেশে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কোন দেশে শিরক বা মূর্তিপূজা প্রাধাণ্য লাভ করেছে এবং কালচারও গড়ে উঠেছে। এ বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে সাধরণতঃ দু-গোষ্ঠির ধর্মই প্রাধন্য লাভ করেছে। সেমিটিক ধর্ম ও আর্য ধর্ম। সেমিটিক ধর্মের আওতায় আসে ইয়াহুদী, খ্রীষ্ঠান ও ইসলাম ধর্ম। যার পীঠস্থান মধ্যপ্রাচ্য। এসব ধর্মের সব রাসূলই নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছেন। আর্য ধর্মের আওতায় আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৌন এবং পারসিক ধর্ম। যার পীঠস্থান ভারতীয় উপ-মহাদেশ ও পারস্য। এ সব ধর্মের প্রচারকগণ সকলেই অবতারবাদী। এ দু গোষ্ঠীর ধর্ম পরস্পর বিরোধী। এ দুয়ের অবস্থান বিপরীত মেরুতে।

'আরব বা সেমিটিক ধর্মমত, চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় একটা বিশিষ্ট স্বকীয়তা বিদ্যমান। জাতি হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট অনস্বীকার্য। 'আরবরা সেমিটিক সম্প্রদায়ভুক্ত সে জন্য তাদের চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবেই বহির্মূখী; পক্ষান্তরে পারসিকগণ ও হিন্দুগণ আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত আর সেজন্য তাদের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে অন্তর্মুখী। 'আরবরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদ (Dualism) অনুযায়ী সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে পৃথক এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের মতো। সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। 'আরবদের মতে আল্লাহ তা'য়ালা সাত-আসমানের উপর তাঁর মহান 'আরশে সমাসীন হয়ে এ মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন। আর ভাববাদী চিন্তাবিদদের মতে বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুর মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। 'আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, আর্যগণ ভাববাদী। 'আরবগণ বেশীর ভাগই নৈতিক গুণে উদ্বুদ্ধ, পক্ষান্তরে আর্যগণ সাধরণভাবেই দার্শনিক ভাবধারায় বিভূষিত। আর্যদের মতে ধরণীর পাপবার লাঘব করার জন্য যুগে যুগে পরম বিধাতা অবতাররূপে এখানে আর্বিভূত হন এবং সে জন্য ফেরেশারূপ কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। এসব আর্য বা পারসিক চিন্তাধারা সর্ব-আল্লাহবাদেরই নামান্তর। এ দিক থেকে সূফীবাদের সাথে আর্য বা পারসিক সর্ব-আল্লাহবাদের অভিন্নতা অনুভূত হয়। সুফীবাদের সাথে তাই পারসিকদের চরম মিল পরিলক্ষিত।

আসল কথা: কিছু 'আরব পর্যটক ভারতবর্ষ থেকে অদ্বৈতবাদের বীজ বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাগদাদে এবং সেখানকার উর্বর জমিতে তা রোপন করেছিল। সেখানকার ইসলামী ও 'আরাবী পরিবেশে তা নতুন রূপে অঙ্কুরিত হলো সূফীবাদে। সূফীবাদের এই চারা গাছটির পরিচর্যা হলো পারস্যের সরস মাঠিতে

এবং সেখানকার বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা সূফীবাদ বিকশিত হলো পূর্ণতা লাভ করল। সূফীবাদের সতেজ বৃক্ষের ফলটা আফগানিস্তানের পথ বেয়ে ভরতবর্ষে পোঁছে গেল এবং সুসলিম বিশ্বে তা সরবরাহ হলো। সূফীবাদের উপর ইসলামী, 'আরাবী ও ফাসী লেবেল লেগে যা ভারতবর্য়ে পৌঁছেছিল আসতে তা ছিল ভারতবর্ষেরই একান্ত সম্পদ বা চিরায়িত দর্শন। ঘরের ধন ঘরেই ফিরে এলা; কিন্তু তার মোড়কটা হলো চকচকে ও অত্যাধুনিক; কেননা ইসলাম ধর্ম তখন নবীনতর ধর্ম ও দুর্বার শক্তি। সূফীবাদের মা'রেফাতের (প্রকৃত রূপের) ভেদ জানতে তারা সমর্থ হলো না। তাই সূফীবাদ সেখানে হলো ত্বরান্বিত।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যে মুসলিম সমাজ প্রভাবিত হয়েছে দুটি ধারায়: পাশ্চাত্যের দর্শন এবং প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ। এ দুটো ধারার ঝড়ো হাওয়া আঘাত হেনেছে ইসলামের উপর কিন্তু তার সুদৃঢ় শিকড়কে নড়াতে সক্ষম হয় নি: এত ইসলামের সাময়িক ক্ষতি হলেও কালের গতিতে তা সামলিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অ-ইসলামী ঝড়ো হাওয়া কিছু অ-ইসলামী রসম, রেওয়াজ ও 'আমল পরগাছার মত ইসলামী বৃক্ষে ঠাঁই নিয়ে বহাল তবিয়তে মুসলিম সমাজে টিকে রয়েছে। সেগুলোই ইসলামী সমাজের সরস জমীন থেকে রসদ সংগ্রহ করে দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। সেগুলোর মূল উৎপাটন না হলে ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার পথে তা অন্তরায় হয়ে থাকবে।

তৃতীয় পর্যায়:

মুসলিম শাসকগণ তাদের শাসনকালে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে। তাদের ভাল কিছু গ্রহণ করেছে; মন্দেরও প্রভাব পড়েছে। অনেক রসম- রেওয়াজ গ্রহণ করেছে রাজনীতির প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক তাগিদে এবং সামাজিক খাতিরে। এ ধরণের অ-ইসলামী ভাব, অভ্যাস ও অনুশীলনের কিছু নমুনা হলো ঃ রাসূলুল্লাহর মিলাদ অর্থাৎ জন্ম দিবস পালন। জার্মে'য়া আল-আযহারের শিক্ষক ডঃ আহমদ শারবাসী বলেন:

"চতুর্থ হিজরীতে ফাতিমীয় এক শাসক মিশরে এ প্রথা চালু করে। পরে মুসূল ও ইরাকে তা চালু হয়। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে।"

ফাতেমীয়াঃ বাদশাহগণ আহলুল বায়েতের দাবীদার হলেও আসলে তাদের সাথে আহলুল বায়েতের কোন যোগসূত্র নেই। এ দুর্বলতাকে সামাল দেয়ার জন্য তারা ঘটা করে মিলাদুন্নাবী চালু করে জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা নাবীর বংশধর। খুলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়াঃ ও আব্বাসীদের মত তারাও খেলাফতের হকদার; এটাই প্রমাণ করতে তারা মরীয়া হয়ে উঠে। মিলাদুন্নাবীর উৎসব বা অনুষ্ঠান যে নবতর সংযোজন (বিদ'য়াঃ)। তার প্রমাণ এই যে ইসলামের স্বর্ণযুগ খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবী এবং তাবে'য়ী এমনকি তাব'য়ে তাাবে'য়ীনদের শ্রেষ্ঠতর যামানায় এ কাজ করার কোন প্রমাণ নাই। ইসলামের সব ব্যাপারে তারাইতো অগ্রগণ্য। যীশু খ্রীষ্ঠের জন্মদিনের অনুকরণে খ্রীষ্ঠান সম্রাটদের মতো মুসলিম বাদশাহরা এ প্রধা চালু করে। এভবে চালু হয় ইসরা ওয়া মি'রাজের অনুষ্ঠান, শবে বরাতের অনুষ্ঠান, কোন পীর বা

ওলীর মৃত্যুবার্ষিকী (ওরস)। হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বনের অনুকরণে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চালু হয়। হিন্দুদের উপয়নের অনুকরণে খাতনার সময় বিশেষ অনুষ্ঠান; মৃত্যুর পর আত্মার কল্যাণ কামনায়- মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনে চল্লিশা/কুলখানী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ বা গুরুজনদের পদপ্রান্তে প্রণিপাত/দন্ডপাত করার অনুকরণে পীর বা বুজুর্গদের কদমে বুসী দেয়া যা কদমবুসীতে রূপ নেয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুক বা হিন্দু সন্ন্যাসীদের জপমালা সূফী ফকীরদের হাত বেয়ে তাসবীহতে পরিণত হয়েছে এবঙ অনেক মুসলিমের হাতে তা এমনি শোভা পেয়ে আসছে যা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া এখন আর মোটেই সহজসাধ্য নয়। এ সম্পর্কে বিখ্যাত প্রাচবিদ (Oriantalist) এ. নিকলসন বলেন:

"ইসলামের সূফীগণ তসবীহ গণণা জানলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের কাছ থেকে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ইসলামের সূফী ধারা, এটা তাদের আপন সংস্কৃতিজাত বস্তু। সাধনা বা ধ্যান মগের প্রক্রিয়া এবং বহু ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি হওয়া সত্বেও এটি বৌদ্ধ যোগাভ্যাসের কাছে অনেকখানি ঋণী।" ১

ইসলামের প্রথম যুগে কারও দ্বারা তসবীর প্রচলন দেখা যায় না। অন্য প্রাচ্যবিদ গোলডজিহার বলেন: "প্রথম পূর্ব দেশীয় ইসলামে এর প্রচলন লক্ষ্য করি যার জন্মভূমি ছিল ভারত। কালক্রমে এই ধারার জন-প্রিয়তা একদিন ইসলামের সূফী জগৎ কে অতিক্রম করে সমগ্র মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে সূফীবাদ প্রচলিত হওয়ার পর তসবী বা জপমালার ব্যাবহার সূফীশাস্ত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি। "

এভাবে ভারতীয় ও অ-মুসলিম রসম-রেওয়াজ, ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস ও পদ্ধতি মুসলমান সমাজে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তা মুসলমান সমাজের অপরিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যা পরধর্ম ও অ-মুসলিম সমাজেরই অন্ধ-অনুকরণ। পরধর্ম ও পরজাতির অনুকরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে সতর্ককরতঃ বলেছেন:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (أبو داؤد)

যে অন্য কাওম বা জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই দলভুক্ত। ২

বর্তমান মুসলিম সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুসমি সমাজের প্রায় সবটাই পরধর্ম এবং পরদেশীদের তাশবীহ বা অনুকরণ। তাহলে তারা আর মুসলিম রইল কিভাবে? সে সমাজ বা ব্যক্তিদের মুসলিম মনে করা হচ্ছে আসলে তারা তো নামে মুসলমান (শব্দটি বিকৃত) মুসলিম প্রকৃত মুসলিম নয়। দুর্ভাগ্যের কথা যে তাদের নিজের নাম বা সত্তা সম্বন্ধেও তারা ওয়াকিফহাল নয়। শুধুমাত্র তাদের খোলসটুকু বাকী আছে।

---

১. Mystics of Islam; পৃষ্ঠা- ১৭

২. আবু দাউদ (আল-লিবাস) নং ৩৫১২; আহমদ (মুসনাদ) নয় ৪৮৬৮, ৪৮৬৯, ৫৪০৯।

পাক-ভারত উপমহাদেশের 'আলেমগণ নানান ধরণের ইসলামী সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হননি। তারা শুধুমাত্র ইসলামের 'ইবাদত ওফাজিলত (ফাজায়েল) প্রচারে ব্যাস্ত ছিলেন এবং ফিকহী মাসয়ালাঃ ও ফিকহার সাথে তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি স্ক্রু-বল্টু দিয়ে এমনভাবে আঁটা ছিল যে এর বাইরে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন নি। আসাস (মৌল) বিষয়বস্তুকে তারা ত্যাগ করে ফার্'য়ী (শাখা-প্রশাখা) মাসলা মাসায়েল নিয়ে আসর গরম করে রাখত যেমন টুপি মাথায় দেয়া ছাড়া সালাত/নামাজ হবে না। সালাতে বুকে উপর হাত থাকবে না পেটের উপর। ওয়ালাদ্দাল্লীন পড়বে না ওয়ালাজ্জাল্লীন পড়বে, তারাওয়ী (তারাবী)'র নামায ২০ রাকা'য়াত না ৮ রাকা'য়াত ইত্যাদি হাজারো গৌণ মাসয়ালা নিয়ে 'আলেমগণ বাহাসে সময় নষ্ট করেছেন।ইসলামের মৌলিক বিষয় 'আকীদার উপর কোন চর্চা হয় নি; যেটুকু হয়েছে তা 'আমল, 'ইবাদত আর ফাজীলত। আখলাকের উপরও কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নি, না 'আকীদার ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়েছে।

দীন ইসলামের বা ইসলাম ধর্মের তিনটি মারাহেল বা পর্যায়ক্রম: প্রথম হচ্ছে 'আকীদাঃ বা মৌল বিশ্বস-তা যথার্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে 'আমল বা 'ইবাদত। 'ইবাদত সুন্নাঃ মুতাবেক পালিত হলে তার প্রতিফলন হবে বাস্তব জীবনের আচার আচরণে- যা আখলাক ও মু'য়ামেলাত। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাক-ভারত উপমহাদেশে বিশেষকরে ইসলামী জগতে সাধারণভাবে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী আখলাক ও মু'য়ামেলাত প্রায়ই অনুপস্থিত; কারণ ' গোড়ায় গালৎ'।

মুসলিমদের 'আকীদাঃ দুরস্ত, 'ইবাদতহ সাহীহ সুন্নাঃ মুতাবেক না হলে আখলাক ও মু'য়ামেলাতর বিকাশ হবে না। ইসলাম হচ্ছে ঈড়সঢ়ষবঃব পড়ফব ড়ভ ষরভব. একটা ছেড়ে অন্যটা অভ্যাস করলে তার অপূর্ণতাই রয়ে যাবে এবং সেভাবেই রয়ে গেছে। তাই সেখানকার ইসলামের সাথে প্রকৃত ইসলামের বরাবরই ফারাক। একথা জোরে সোরে প্রচার করলে স্বদেশ ভক্ত ও ঐতিহ্যপ্রিয় পাঠক প্রশ্নবান ছুড়ে বলবেন; আমাদের দেশের 'উলামা কি এসব জানেন না, তারা কি সকলেই ভুল? 'উলামায়ে কেরাম শ্রদ্ধেয়, তাদের ফাদীলত সন্দেহাতীত কিন্তু অনেক সংস্কার মানুষের মনের জমিনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যার মূল উৎপাটন সহজসাধ্য নয়। মৌলভীদের বা 'আলেমদের কথায় কর্ণপাত করেই বা কয়জন? প্রথাগত, সংস্কারবদ্ধ ও যুগ যুগ ধরে লালিত অভ্যাসের বিরুদ্ধে কথা বললেই মানুষ চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলবেই:

﴿ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ﴾ (سورة الشعراء-٧٤)

তারা বলল বরং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি।

(সূরাঃ আশ-শু'য়ারা, আয়াঃ ৭৪)

একদল তো মাযহাবের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি খাড়া করে; সংখ্যাগরিষ্ঠতা গণতন্ত্রে কাম্য হতে পারে কিন্তু ইসলামে নয়; কেননা অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (سورة يوسف-١٠٦)

অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে বটে কিন্তু তারা শির্ককারী।

(সূরাঃ য়ূসুফ, আয়াঃ ১০৬)

অধিকাংশ লোক যা বলে বা করে তা দালীল নয়। আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীই সর্বাগণ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ...)) (رواه مسلم)

শেষ পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দলই (নগণ্য সংখ্যক) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ১ (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম বলেছেন:

...((إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِي الاهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)) (رواه أحمد)

আহলুল কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান) তাদের দীনের ব্যাপারে ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার এ উম্মাঃ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ বাতেলপন্থী, তাদের সকলেই জান্নামী হবে শুধুমাত্র একটা দল ছাড়া-তারা হলো **আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াঃ**। ২

অন্য বর্ণনায়:

...((كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي...)) (رواه الترمذى)

সকলেই জাহান্নামী হবে কেবলমাত্র একটা দল ছাড়া - তারা জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন: যে আদর্শের উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছি। ৩

---

১. মুসলিম (আল-ইমারাঃ) নং ৩৫৪৮; আবূ দাউদ (মুসনাদ আশ-শামীইন) নং ১৬৩২৪।
২. আবূ দাউদ (সুন্নাঃ) নং ৩৯৮১; ইবনে মাজাঃ (আল-ফাতান) নং ৩৯৮৩; আহমাদ (মুসনাদ আশ-শামীইন) নয় ১৬৩২৯।
৩. আবূ দাউদ (সুন্নাঃ) নং ৩৯৯১; তিরমিযী, ইবন মাজাঃ (আল-মুকাদ্দিমাঃ) নং ৪২; আহমদ (মুসনাদ আশ-শামীইন) নং ১৬৫২১, ১৬৫২২; আদ-দারেমী (মুকাদ্দিমাঃ) নং ৯৫।

আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াঃ বলতে বুঝায় আল্লাহর বাণী (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণকারীদেরকে; যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ৭৩ ভাগের একভাগ মাত্র। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাঃ, সাহাবী, তাবে'য়ীন, তাবে' তাবে'য়ীন এবং সালফ-সালেহীনদের পথ অনুসরণকারীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প। আর এই স্বল্প সংখ্যকই মুক্তিপ্রাপ্ত বা সফল দল। সংস্কারের কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী, বিশেষ ফড়মসধ'য় বিশ্বাসী, কোন চটকদার রংস'র সমর্থক, কোন মনগড়া মতবাদের অবলম্বীকে তাদের ংঃধঃঁং য়ঁড় থেকে নড়ানো সহজসাধ্য নয়। প্রমাণসিক্ত দলীল ও যথার্থ যুক্তি খাড়া করলেও তাদের প্রচলিত মতবাদ, বদ্ধমূল বিশ্বাস ও চিরায়ত 'আকীদাঃ'র পরিবর্তন কঠিনতর-ইল্লা ম্যা শ্যা আল্লাহ। আল্লাহ যাদের হৃদয়কে প্রসারিত করেছেন, চক্ষুকে করেছেন উন্মুক্ত- শুধুমাত্র তারাই হিদায়েত প্রাপ্ত হন। তাদের জন্যই এ বইয়ে অবতারণা। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের কাছেই গৃহিত হবে ইসলামের সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বাণী। প্রসঙ্গ শেষ করার আগে পাঠকদেরকে বিশেষ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো সঠিক ও নির্ভেজাল 'আকীদাঃ। আর এ 'আকীদাঃ কুরআন ও সাহীহ হাদীছ মুতাবেক না হলে সবই বৃথা; 'ইবাদত, আখলাক ও মু'য়ামেলাঃ সবই পন্ডশ্রম।

সুদৃঢ় সঠিক ও মজবুত ভিত্তির উপরে গড়ে উঠে সুউন্নত সৌধ। ইসলামের মূলই হলো 'আকীদাঃ। ইসলামের শত্রুরা এবং ইসলামের ছদ্মবেশধারী মুনাফিকরা ইসলামের মূল ভিত্তি 'আকীদাকে ধ্বংস করতে যুগে যুগে তৎপর। নানানভাবে তারা ইসলামের মধ্যে অইসলামী 'আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদর সে প্রয়াস এখনও অব্যহত।

সঠিক 'আকীদার গুরূত্ব ও বাস্তবায়নের কথা শুনরে তারাই বেশী বেজার হন যারা 'ইবাদত ও ফজিলত নিয়ে মশগুল। তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে এতদিন ধরে যে ইসলাম জেনে এসেছেন তার নেকাবটা একটু হটিয়ে দিয়েই দেখুন বেরিয়ে আসবে ইসলামের আসল রূপ। প্রকৃত ইসলামই আমাদের কাম্য। সংস্কৃতির চোরাপথে যে সব গায়ের-ইসলামী 'আকীদাঃ ভাবধারা, অভ্যাস এবং অনুশীলন ইসলামী সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই ইসলামের পূর্ণ বিকাশ হবে। প্রকৃত ইসলামের বাস্তবায়ন ও পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম সমাজের দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাত (মুক্তি) এবং ফালাহ (সাফল্য)।

†kl chvq:

ভারতীয় মুসলিম সমাজ পরধর্মের বা অ-ইসলামী 'আকীদাঃ রংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণে। অনুরূপভাবে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরেও ইসলামী প্রবাব পড়েছে। ভারতে মুসলিম আগমনের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসে। ইসলামী প্রভাবে ভারতের দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলাসমূহ সংস্কৃতিকর্মের নানান শাখায় সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিমদের দ্বারাই আর্যধর্ম বা সনাতনধর্ম হিন্দুধর্ম হয়েছে। বিলাদ আস-সিন্ধ (সিন্ধুদেশ)'র 'স' কালক্রমে পরিবর্তন হয়ে 'হ' এ রূপ গ্রহন করে। বঙ্গাদেশের কোন কোন অঞ্চলে স/শ এর উচ্চারণ করে 'হ" যেমন শালা=হালা। সিন্ধুর অপভ্রংশ হিন্দু থেকেই হিন্দুধর্ম বা হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্মের আসল নাম সে সনাতনধর্ম বা বৈদিকধর্ম সে কথা কি হিন্দুবর্তা প্রতিষ্ঠার প্রবক্তগণ জানে? ভারতীয় হিন্দুধর্মের প্রভাব মুসলিম ধর্মের উপর।

এ সম্পর্কে ডঃ তারাচাঁদের: The Influence of Islam and Indian Culture এবং ডঃ বি.এন. পান্ডের: Islam and Indian Culture বইয়ের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ আছে। আর এ বইদুটোই ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বহুল প্রশংসিত।

অতি সংক্ষেপে: ইসলাম ধর্ম ও আর্য ধর্মের পারস্পরিক সংঘাতে ভারতের সম্বন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এদের প্রবক্তা হলেন: রমানন্দ, কবীর, নানক। পরবতীকালে হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই একেশ্বরবাদের ধারণা প্রবল হয়ে উঠে। ফলে গড়ে উঠে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ। ভারতের কৃতি সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ঠধরফরপ ইৎধরহ এবং ওংষধহরপ ইড়ড়ফু 'র সম্বন্বয়ে নয়া-ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখে ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। কালের আবর্তনে সব কিছুই হিন্দু সমাজে মিশে যায়। দু-ধর্মের মিলন ধারার প্রয়াসে হিন্দুধর্মের পরিবর্তন সাধিত হয়। হিন্দধর্ম স্থবিরতা মুক্ত হয়ে গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণবন্ত হয়, বাস্তবমূখী ধর্মে পরিণত হয়। ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার আসে। নদের নিমাই শ্রী চৈতন্যদেব চন্ডালে ধরি দেই কোল প্রচার করলেন। ফলে রুদ্ধ হলো চন্ডালদের ইসমে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার স্রোত। যবন হরিদাস প্রধান গোঁসাই হলেন। আর এর বৈপরিত্যে মুসলিম সামাজের সূল 'আকীদাঃ দেওলিয়া হতে লাগল।

দু-ধর্মের মিলন বা সম্বন্বয়ের ধারা এখনও ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিদ্যমান। বহু মুসলিম সন্তান শুধু আজ নামেই মুসলমান। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম নামগ্রহণ করেও তারা মুশরিক, মুনাফিক এবং ফাসিক ও বে-দীন হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨١ ﴾ (سورة المائدة – ٨١)

যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং নাবীর প্রতি যা অবতীর্ণ তাতে ঈমান আনত তাহলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক (সত্য-ত্যাগী)।

(সূরাঃ আল-ম্যায়েদাঃ; আয়াঃ ৮১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦﴾ (سورة يوسف)

অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে বটে কিন্তু তারা শিরককারী।

(সূরাঃ য়ূসুফ, আয়াঃ ১০৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান কুরআনের অনুবাদক, মহানবী সহ অনেক বইয়ের লেখখ, স্বনামধন্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের স্নেহাস্পদ পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, মানসূর হাল্লাজের সমর্থক, হিন্দু অদ্বৈতবাদে গভীর বিশ্বাসী ডঃ ওসমান গণী Ph.d & D.Litt ডিগ্রীধারী। তিনি তার কাব্যকানন গন্থে লেখেছেন:

কাবা ও কাশি

যে নামেতেই ডাক মোরে সবই মোর নাম
যেখানেতেই খোঁজ মোরে সবই মোর ধাম।
বাগদাদ বৃন্দাবনে কেন রেষারেষি
এক-ই স্থানের ভিন্ন নাম কাবা ও কাশি।
মথুরা আর মদীনায় কেন হানাহানি
আমার সকল স্থান এক-ই আমিজানি।
যেখানেতেই দেখ মোরে সবই মোর ধাম
মক্কায় রহীম আমি মথুরাতে রাম।
ভেদাবেদ নাহি কর কৃষ্ণ ও করীম
দুই নই এক-ই জন রাম ও রহীম।
কোথাও আল্লাহ আমি কোথাও ভগবান
কোথাও ঈশ্বর আমি, কোথাও রহমান।
এক-ই জনের ভিন্ন নাম সবই মোর নাম
এক-ই স্থানের ভিন্ন নাম সবই মোর ধাম। কাব্যকানন।

ডঃ ওসমান গণীর উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে ভারতীয় অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ধারণাগুলো পুরোপুরি ইসলামবিরোধী ধারণা। এ ধরনের 'আকীদাঃ যে পোষণ করে সে ইসলাম ধর্মের দায়রাঃ থেকে বের হয়ে যায়। এটা তো জঘন্যতম শিরক। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মুসলমান এ ধরনের 'আকীদায় বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস আর ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস বা 'আকীদাঃ সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এ দুয়ের অবস্থানও বিপরীত মেরুতে। এ দু-ধর্মের মিলন প্রয়াস কখনও সফল হয় নি এবং হবেও না যেমন বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত দীন-ই ইলাহী।

এক ধর্মের মৌল বিশ্বাস মেনে নিলে অন্য ধর্মে মৌল বিশ্বাসকে অস্বীকার করতেই হয় নইলে এ কুলও যায় ওকুলও যায়। এতে তাঁতীকুলও থাকে না বোষ্টম কুলও না।

'আকীদাঃ বা বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলামে কোন আপোষ নেই, সমঝোতাও চলবে না; কারণ 'আকীদাঃ বা মৌল বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। আর মূল ভিত্তি বা আসাস সঠিক না হলে সবই বৃথা। ইসলামী 'আকীদায় যারা বিশ্বাসী নয় তাদের উপর জোরাজুরি নেই। ধর্মের ব্যাপারে তো আর কোন জবরদস্তী খাটে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة البقرة – ٢٥٦)

ধর্মের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সু-পথ প্রকাশ্যভাবে কু-পথ থেকে পৃথক হয়েছে; সুতরাং যে তাগুত (মিথ্যা-উপাস্য) কে অস্বীকার করে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরল যা কখনও ভাঙবে না; আল্লাহই সর্বশ্রোতা সর্ব জ্ঞানী। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ; আয়াঃ ২৫৬)

মুসলিমদের তো কর্তব্য হলো তাদের ধর্মের প্রকৃত 'আকীদাঃ বিশ্বাস), 'আমল/'ইবাদত আখলাক (চরিত্র), মু'য়ামেলাত (লেনদেন) ও (কর্ম/উপাসনা) মানহাজ (জীবন পদ্ধতি) ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা। আর তা না হলে নামেই মুসলমান হবে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না।

সর্বশেষে জানাই ঃ দীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজে যে সব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যে সব রসম- রেওয়াজ চলে আসছে সেগুলো অ-ইসলামী প্রমাণিত হলেও তা পরিত্যাগ করতে অনেকে দ্বিধান্বিত। এটা হলো মানুষের লালিত কালচারের উপর টিকে থাকার মজ্জাগত মোহ, স্বভাবজাত সংস্কার। অস্থিত্ব বজায়ের প্রশ্ন।

সত্যকে প্রকাশ করলে প্রশ্ন থেকেই যায়: এত দিন ধরে যা করে আসলাম, জেনে আসলাম তা সব কি ভুল? অনেকেই সে ভুল সংশোধনে সচেষ্ট হন না। কঠিন সত্যকে গ্রহণ করার মননশীল মানসিকতা আছে ক'জনের?
দার্শনিক স্পিনোজা বলেন:
The truth is cruel, but it can be loved and it makes free those who love it.
সত্য রূঢ় তবুও তা ভালবাসা যেতে পারে; এবং যারা সত্যকে ভালবাসে তারাই মুক্তি পায়।
'আরবী প্রবাদে বলে:

الصدق ينجي والكذب يهلك
সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।

সত্য চিরকালই কঠোর, রূঢ় এবং তিক্ত, কিন্তু শাশ্বত ও চিরন্তন।

হাদীছে বণীত:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. (مسند احمد)

আবূ যার (রাদী আল্লাহু 'আনহু থেকে বণীত, তিনি বলেন আমার প্রিয় বন্ধু রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেন আমি যেন সত্য বলি যদিও তিতো হয়। (মুসনাদ আহমাদ)
হেকিমী বা আয়ুর্বদীয় শাস্ত্র অনুযায়ী তিতো ঔষধ বদহজম বা অজীর্ণ নিরাময় সহায়ক। 'আকীদাঃ, রসম-রেওয়াজ ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় সব মুসলিম দেশ যে অজীর্ণতাজনিত ব্যারামের প্রকোপ চলছে- এ বইয়ের তিতো কথাগুলো তা নিরাময়ে সহায়তা হবে। ইন শাা আল্লাহ- إن شاء الله

والله هو الموفِّق والهادي الي سواء السبيل.

Reference

১. হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব – ডঃ দুর্গাদাস বসু, সরস্বতী (ভারতের জাতীয় সম্মান প্রাপ্ত: পদ্মভূষণ (১৯৮৫) জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক (১৯৮৬), জাতীয় নাগরিক সম্মান (১৯৯১), সাম্মানিক সদস্য, এদিয়াটিক সোসাইটি (১৯৯৪)। প্রকাশক: ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

২. বৃহদারণ্যক ইপনিষদ্ (যজু), (১।৪।১০), ... য এবং বেদাহং ব্রস্মাস্মীতি স উদং সর্বং ভবতি ...। (২।৫। ১৯); ৪।৪।৫)। ছান্দাগ্য উপনিষদ্ (সাম)।

৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ–পৃষ্ঠা ১০; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শী অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ: শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ভারত।

৪. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস – ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য = জেনারল প্রাইভট লিমিটড, ২১১, লেনিন সরণী, কলিকাত্

৫. লোকজীবন বাংলার লৌকিক ধর্মসংঙ্গীত ও ধমীয় মেলা – ডঃ তৃপ্তি ব্রস্মা।

৬. বঙ্গো সূফী প্রভাব – ডঃ ইনামুল হক।

৭. সূফী দর্শন, পৃষ্ঠা ২১৮–২১৯: ডঃ ফকীর আবদুর রশিদ। প্রাগ্রেসিব বুক কর্ণার ঢাকা।

৮. ইসলামী জগৎ ও সূফীসমাজ, পৃষ্ঠা – ৩৫৯: ডঃ 'ওসমান গণী। মল্লিক ব্রাদাস, কলিকাতা।

আল্লাহ না খোদা?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাবাসীদেরকে যে ইলাহ বা উপাস্যের পরিচয় দেন তিনি আল্লাহ; এবং ঘোষণা করেন:

لا إلـهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله

"আল্লাহ ছাড়া কোন/ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বা দুত।

আল্লাহর স্বরূপ জানান'র জন্য রাসূলের আবশ্যক।

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জন্মের পূর্বে 'আরবগণ আল্লাহর নাম জানত; কিন্তু তারা বহু ইলাহ'র পূজা করত যেমন লাত, উয্যাঃ, মানাত, হুবাল ইত্যাদি। হিন্দুধর্ম এখন পর্যন্তও পুরোপুরি বহুদেববাদ। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হয় নি; তাই ঈশ্বর বা ভগবান আছেন কিনা সে কথা আসে না। গৌতম বুদ্ধ পরে বুদ্ধদেব বা ভগবানে পরিণত হয়েছেন। প্রাচীন পারসিকদের দু'জন খোদা ছিল। একজন মঙ্গলের খোদা–অরমুজদ, অপরজন অমঙ্গলের খোদা–আহরমিন। খ্রিষ্টানরা মনে করে God তিনজন God the Holy Father, God the Holy Son, God the Holy Ghost হিন্দুধর্মে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন মিলে একেশ্বর।

ইসলামে যে ইলাহ বা উপাস্যের কথা বলা হয়েছে তিনি একক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শারীক নেই। তাঁর ইসম যাত অর্থ্যৎ প্রকৃত নাম **আল্লাহ**। আল্লাহ শব্দটি অতুলনীয়। অন্য কোন ধাতু হতে তা উদ্ভূত নয়। ভগবান, ঈশ্বর, এড়ফ ইত্যাদি শব্দের বহুবচন আছে, স্ত্রী লিঙ্গ আছে; কিন্তু আল্লাহ শব্দের সেরূপ রূপান্তর নেই। আল্লাহ শব্দটি সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত একক ও অনুপম এক নাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্মে আল্লাহ শব্দটিকে মুসলমানরা তরক করে প্রহণ করেছে অন্য নাম খোদা। আসলকে ত্যাগ করে নকল নিয়ে টানাটানি। খোদা শব্দটি ফারসী শব্দ, অর্থ স্বয়ম্ভু অর্থাৎ যিনি নিজেই সৃষ্ট। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর ৯৯ নামের কথা বলেছেন তার মধ্যে এ ধরনের কোন অর্থ নেই। এছাড়াও আল্লাহর সে সব নাম আছে তার মধ্যে সৃষ্টি বিষয়ক নাম বা সিফাত হলো ঃ

আল্–খ্যালেক	–	(স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা)
আল্–ব্যারী	–	(সৃজনকারী, গঠনকারী, স্রষ্টা)
আল্–মুসাওয়ির	–	(আকৃতি গঠনকর্তা, আকারদাতা)
আল্–মুবদী	–	(প্রথম আবিস্কারক, প্রথম সৃজনকারী)
আল্–ব্যাদী	–	(সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা)

ফারসী খোদা'র যে অর্থ তা আল্লাহর ৯৯ নামের মধ্যে নেই। এ ছাড়াও আল্লাহর যে সব নাম বা সিফাত কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে তার অর্থ খোদা অর্থের

সাথে মিলে না। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেকে স্বয়ম্ভূ বা খোদা অর্থে নামকরণ করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও এ ধরনের কোন অর্থে আল্লাহর পরিচয় দেন নি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেন নি বা সমর্থন করেন নি তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য? আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গুণাবলীর ব্যাপারে কে বেশী অবহিত? খোদা শব্দের যে অর্থ তা কি আল্লাহ শব্দের সমার্থ?

আমাদের প্রতিপালকের প্রকৃত নাম (ইস্‌ম যাত) হচ্ছে আল্লাহ; বাকী নামগুলো তাঁর সিফাত বা গুণাবলী। আল্লাহকে কেন্দ্র করেই বাকী নামগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে।

খোদা خُدا শব্দের বানান হওয়া উচিত খুদা, যেমন ঃ محمد শব্দের বানান মুহাম্মদ; মোহাম্মদ নয়।

খুদা শব্দের মাসদার খুদ অর্থাৎ স্বয়ং বা নিজ। এ শব্দকে নিয়ে বিখ্যাত কবি ইকবালের জীবন দর্শন খুদী।

'খুদীকো কর্ বুলন্দ ইত্‌না কেহ্
হর্ তাকদীর ছে পাহ্‌লে
খুদা বন্দা ছে পুছে
বাতা তেরা রেযা কিয়া হ্যায়।'

অর্থ ঃ

আত্মা বা নিজকে এতই উন্নত করবে,
যেন প্রত্যেক ভাগ্য নির্ধারণের পূর্বে
খোদা বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবে,
বল তোমার অভিলাষ কি?

কবি ইকবালের বহুশ্রুত এই শায়ের/কবিতা তার বহু অনুরাগী উর্দূ-ভাষীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যা ইসলামী ধারণার বিপরীত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (سورةغافر- ٦٠)

এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরাঃ গাফের, আয়াঃ ৬০)

আল্লাহর কাছে দু'য়া করতে হবে, তাকে ডাকতে হবে, তাঁর কাছে আমাদেরকে চাইতে হবে, তাহলে আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন এরই নাম 'ইবাদত। এজন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। একজন মানুষ তার খুদীকে বুলন্দ করল আর আল্লাহ সে বান্দার রেযামন্দী পুছ করেই সে বান্দাকে কিছু দেবেন এটা একেবারেই আল্লাহর ক্ষমতা ও ইরাদাবিরোধী ধারণা। আল্লাহ কি বান্দাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন? না'উযুবিল্লাহ মিন যালিক। এটা সঠিক

ইসলামী আকীদাঃ মুতাবেক নয়। খোদা শব্দের সাথে কবিতায় শা'য়েরীর আবেগ প্রবণতার এ এক তাওহীদবিরোধী সংযোজন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ (سورةالأعراف– ١٨٠)

আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম আছে; সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। (সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াঃ ১৮০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর ৯৯ নামের খবর দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দু'য়া করার যে আদব তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো আল্লাহর নাম স্বরণ করে, তাঁর প্রশংসা করে এবং নাবীর উপর সালাত ও সালাম পড়ে আল্লাহর কাছে দু'য়া করতে হবে। যারা আল্লাহর প্রকৃত নামই জানে না এবং আল্লাহর নাম স্বরণ না করে আল্লাহর কাছে দু'য়া করে সে দু'য়া আদব মুতাবেক হয় না। তাহলে এ ধরনে দু'য়া আল্লাহর কাছে কিভাবে গৃহীত হবে? জানি আল্লাহ অন্তর্যামী – বান্দার নিয়তই আল্লাহর কাছে বিবেচ্য কিন্তু তা উসূল মুতাবেক না হলে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? যারা আল্লাহর ইস্‌ম যাত (প্রকৃত নাম) এবং ইস্‌ম আ'জম (মহান নাম) ধরে আল্লাহর কাছে দু'য়া করবে তাদের দু'য়া কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। আর যারা এর উল্টো তরীকায় দু'য়া করবে তাদের দু'য়ার কি হবে? আশাকরি ন্যায়দর্শী পাঠকের উপলব্ধি হয়েছে।

পাক-ভারত উপমহাদেশ, ইরান এবং আফগানিস্তানে ইসলামের পরিচর্যা হয়েছে ফারসী ভাষাতেই। ফারসী ভাষাকে ইসলামী ভাষা মনে করা হতো। তাই ফারসী খোদা ঠাঁই করে নিয়েছে এসব দেশে। ভারতীয় মুসলিমগণ নিজেদের ভাষায় আল্লাহর প্রতিশব্দকে ত্যাগ করে খোদাকে সঠিক সঠিক মনে করেছিল ভারতীয়দের সাথে পার্থক্য করার মানসিকতায়। ঈশ্বরের ঈশ্বরী আছে, ভগবানের ভগবতী আছে, ব্রহ্মার পুত্র-কন্যা আছে এ শব্দগুলো তাওহীদ বিরোধী তাই পরিত্যাজ্য। মুশরিক বা হিন্দুদের ঈশ্বর বা ভগবান নামের পরিবর্তে খোদা/খুদা নামের দ্বারা অমুসলিমদের তাশবীহ (অনুকরণ) থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং অমুসলিমদের সাথে পার্থক্য প্রকাশ হয়ে মুসলমানিত্ব জাহির হয়েছিল।

খোদা শব্দের উৎপত্তি ও এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তা দ্বিত্ববাদের 'আকীদাঃ/বিশ্বাস। প্রাচীন পারসীকদের দুজন খোদা ছিল একজন মঙ্গালের, অপরজন অমঙ্গালের। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ এবং হিন্দুদের বহুদেববাদ – এসব বাদই ইসলামের একত্ববাদের বিপরীত। আল্লাহ'র কোন সঠিক প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় গ্রহণ করা হয়নি কেননা তা ছিল শির্‌ক। তাই পারসীয় খোদা গৃহীত হয়েছিল কিন্তু খোদা'র মধ্যেও তো শির্‌কের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাহলে ভারতীয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা ভগবানের সাথে পারসীয় খোদার ফারাক কি?

ভারতীয় বহুদেবতাবাদ, পারসীয় দ্বিত্ববাদ এবং খ্রীষ্টানীয় ত্রিত্ববাদ - এসবই ইসলামের মূলনীতি তাওহীদের পরিপন্থি।

আল্লাহর পরিবর্তে খোদা শব্দের ব্যবহারকে না-জায়েজ বা শির্ক ফাতাওয়া দিতে পারি না; তবে একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে : খোদা বলার চেয়ে আল্লাহ উচ্চারণ সব দিক থেকেই শ্রেয়ঃ।

নাম কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীক। লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটাই বেশী ভালবাসে; এমনকি নাম বাঁচানোর জন্য অনেকে মরতেও কুণ্ঠিত হয় না। নামপ্রিয় মানুষের মন্দনামকে সুন্দর করে ডাকলেও সে তা কবুল করে না। যার নাম ফকীর তাকে আমীর নামে ডাকলে, কালা কে ধলা, ভূতনাথ কে নলিনীকান্ত কিম্বা কড়োনিকে খাদীজাঃ ডাকলেও অসহ্য বোধ হয়। তাহলে সুন্দর নামধারী ব্যক্তির নামকে বিকৃত করে অসুন্দর নামে ডাকলে তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়স্থানে আঘাত করা হয় না কী?

বিশ্ব-প্রতিপালক মহান আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম আছে- সে সব নামে তাঁকে না ডেকে অন্য সব অসয়গত বা বেমানান নামে তাঁকে ডাক বা নাপমকরণ করা হলে তাঁর অস্থিত্বের অমর্যাদা করা হয়, তাঁর নামের মাহাত্ম ক্ষুন্ন করা হয় তার ওরিজিন্যালিটি বা মৌলিকতা নষ্ট করা হয়।

আল্লাহর বদলে খোদা বললে আসল বা ওরিজিন্যালটি পাওয়া যায় না। এ যেন কমলালেবুর পরিবর্তে ভিটামিন সি খাওয়। প্রয়োজন তাতে পুরা হতে পারে; কিন্তু আসল বস্তুর টেস্ট মিলে না।

কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ নামই ব্যবহৃত হয়েছে তাই মুসলিমদের উচিত তাদের ইলাহকে আল্লাহ বলে ডাকা এবং সেটাই উত্তম ও উৎকৃষ্টতর। পরিশেষে আল্লাহর পরিহাস দিয়েই শেষ করতে চাই যে কথা তিনি ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যা সর্বকালে সর্বজনের জন্যই প্রযোজ্য ঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْر... ﴾ (سورةالبقرة-٦١)

তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে বদল করতে চাও?

(সূরাঃ আল-বারাকাঃ, আয়াঃ ৬১)

আল্লাহ সাকার না নিরাকার

আল্লাহর ইস্‌ম-যাত (প্রকৃত নাম) যারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করে না, যারা আল্লাহর নামের গুরুত্ব অনুধাবন করে না এবং যারা আল্লাহর নামের স্বরূপ জানে না তারা কী ভাবে আল্লাহর প্রতি সঠিক ধারণা করবে? আল্লাহর প্রকৃত সত্তা ও গুণাবলী উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলে তার স্বরূপ কী ভাবে উপলব্ধি হবে? পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রায়ই শুনা যায় ঃ আল্লাহ নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান। এ বিশ্বাস হিন্দু-ধর্মের মূল বিশ্বাস ঃ ব্রহ্ম একক, অদ্বিতীয়, নির্গুন। তিনি নিরাকার ও সর্বত্র বা সর্বভূতে বিরাজমান। ১

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব বইয়ের মধ্যে ডঃ দুর্গাদাস বসু স্বরস্বতী বলেন ঃ " .হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব হইতেছে এই যে বক্ষ একাধারে মূর্ত এবং অমূর্ত, সাকার এবং নিরাকার, অরূফ এবং বহুরূপী সবই- কারণ তিনি ছাড়া আর কিছুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; আমরা বিশ্বব্রহ্মান্ডে যে বহু রূপ দেখিতেছি, তাহ সবই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি।"

তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেন ঃ "...উর্ণনাভ* যেমন জালের দ্বারা নিজেকে বিস্তৃত করে, অগ্নি হইতে যেমন সহস্র স্ফুলিঙ্গা নির্গত হয়, তেমনি অব্যক্ত ব্রহ্ম নিজেকে বিস্তৃত করিয়া বহুরূপে ব্যক্ত হইলেন। স্ফুলিঙ্গা যেমন অগ্নি হইতে পৃথক নহে, তন্তু যেমন উর্ণনাভ হইতে ভিন্ন নহে, সৃষ্ট ব্রহ্মান্ড তেমনি ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। সবটাই সেই অখন্ড বিশ্বাত্মার অভিব্যক্তি। স্থবর জঙ্গাম সবই সেই ব্রহ্ম।"

... যেহেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তাহার কোন রূপ বা শরীর থাকিতে পারে না। এই জন্যই বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রাণস্বরূপ এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে তৎ এই ক্লীবলিঙ্গা সর্বনাম উপনিষদে বহুস্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে। তিনি বাক্য, মন এবং সর্বেন্দ্রিয়ের অতীত, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহার কোন আকৃতি নাই। নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝাইতে কখনও প্রজ্ঞান বা চেতন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।"

" যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার এবং সাকারকে অবলম্বন করিলে সেই নিরাকারেই পোঁছানো যায়, এই তত্ত্ব ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিজ প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে বার বার শুনাইয়া গিয়াছেন। যিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দ চিন্তা করিতে সক্ষম, তাহার নিকট নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর সত্তা নাই। ...চিৎসমুদ্রের অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। ...ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল জমাট বাধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাত হয়ে কখন কখন সাকাররূপে দেখা দেন। আবার জ্ঞান সূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।" ২ অর্থাৎ নিরাকার হয়ে যায়।

---

১. শ্রীমদ্ভগবত গীতা যথাযথ: কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কত্তৃক সম্পাদিত. অনুবাদ ঃ শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট. মায়াপুর।

২. হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব. পৃষ্ঠা-৭৯.৬২. ৪৮। * উর্ণনাভ - মাকড়সা।

"তাই সাকারের উপাসক পরিণামে সেই নিরাকরেই উপনীত হন। কালীরূপে চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপর দেখতে পায় যে সেই রূফ অখন্ডে লীন হয়ে গেল।" ১

হিন্দুধর্ম ও ইসলামের অবস্থান বিপরীত মেরূতে। হিন্দুধর্ম বহুশ্বরবাদ আর ইসলাম একেশ্বরবাদ বা তাওহীদবাদী ধর্ম। মূর্তিপুজক বা পৈত্তলিকদের দ্বারা ইসলাম বরাবরই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মূর্তিপূজারীদের মুকাবেলা করতে হয়েছে কেননা এ দুয়ের বিশ্বাস বা 'আকীদাঃ পরস্পরবিরোধী। হিন্দুধর্মে তত্ত্বগতভাবে ঈশ্বরের নিরাকারত্ত্ব স্বীকার করলেও বাস্তবে তারা সাকারত্ব বা দেব-দেবীর পুজা করে থাকে। মুসলিমগণ যে আল্লাহর 'ইবাদত করে তার কোন মূর্তি নেই। তাই যে সব মুসলিম সঠিক 'আকীদার খবর রাখে না তারা হিন্দুদের সাকার বা মূর্তিমান দেবতার বৈপরিত্যে নিরাকার আল্লাহর ধারণাকে গ্রহণ করেছে। এজন্যই পাক-ভারত এবং কিছু মুসলিম দেশে প্রায়ই শুনা যায় ঃ **আল্লাহ নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান...** ইত্যাদি। বাংলাদেশর জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী-ঢাকাবোর্ডের ইসলামী শিক্ষা বইয়ের মধ্যে একথাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিগত কয়েক বছর থেকে এ সব কথা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে কেননা এ ধারণা ইসলামসম্মত নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ডঃ ওসমান গণী তার লেখা **মহানবী** বইয়ের অষ্ঠম অধ্যায়ে **মেরাজ** বা হযরতের স্বর্গে আরোহণ বয়ান করতে আল্লাহকে **নিরাকার** বানিয়েছেন। সাকার মহানবীকে নিরাকার আল্লাহর মধ্যে বিলীনকরতঃ তিনি লিখেছেন ঃ

"এখন বুঝা যাচ্ছে, হযরতের আরোহণ কয়েক সেকেন্ডের বা মহূর্তের বা মিনিটের, কয়েক দিন বা মাস বা বছরের নয়। কারণ জাগতিক বছর ধরতে গেলে কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা যায় নি। কেননা নবীর আয়ুস্কাল মাত্র ৬৩ বছর। আবার এই মেরাজ শব্দটি আল্লাহ ব্যাবহার করেছেন -- ফেরেশতা ও রূহের জন্য, যাদের কোন শরীর নেই। যুক্তির খাতিরে আমরা আরও দু একটা দিক লক্ষ্য করতে পারি। মিল এক শ্রেণীতে হয়। যেমন জল জলের সঙ্গে মিশতে পারে, তেলে জলে মিল হয় না। তেমনি আকার আকারের সঙ্গেই মিশবে, নিরাকার নিরারের সঙ্গেই মিশবে। কিন্তু আকার ও নিরাকারে মিলতে পারে না। আল্লাহ নিরাকার এবং মহানবী আকার দেহ বিশিষ্ট। সুতরাং এখানে মিল অযৌক্তিক। তবে আল্লাহ কি আকারে আসবেন, সেটাও অযৌক্তিক, বরং আকার বিশিষ্ট মহানবী বিলীন হয়ে উন্নতী হলেন এবং মিলন হলো।

---

১. হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব পৃষ্ঠা-৯৮, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কথা (১।৬২, ২২৬) কথা (১। ৬২ ; ১।২২৮) কৈবল্য উপনিষদ, (১। ১৭-২৪) যৎ পরং ব্রক্ষ শব্দং পরমাত্মরূপম। কথা (১। ৮২), কথা (১।১৯৫)।

... অতএব মানুষের সাথে আল্লাহর সে সাক্ষাৎ সেটা অশরীরী সাক্ষাৎ.... সুতরাং নিরাকার আল্লাহর সঙ্গে তাঁর দুতের আকারবিহীন রুহের অন্তরে মিলন হয়েছিল...। "

ডঃ ওসমান গণীর উপরোক্ত কথাগুলো সবই কল্পনাপ্রসূত, আজগুবী, মিথ্যা যা ইসলামী 'আকীদাঃ বিরোধী। মৌলানা আকরাম খাঁ তার লেখা মোস্তফা চরিত বইয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র রুহানী মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল–কথা প্রচার করলে হানাফী ও আহলে হাদীছদের মধ্যে তা প্রত্যাখাত হয়। মোস্তফা চরিতের মত এমন পান্ডিতাপূর্ণ বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়।

ডঃ ওসমান গণী তার মেরাজের অপব্যখ্যায় আকার বিশিষ্ট মহানবীকে কিভাবে নিরাকার আল্লায় বিলীন করালেন। তার এ ধারণাটাই মিথ্যা, কল্পণাপ্রসূত, অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী। আল্লাহ যদি নিরাকার না হয় তাহলে তো পুরা ধারণাই মিথ্যা। জীবনী লেখতে কল্পপার সাহয্য নেয়া চলে না, অবাস্তর, অবান্তর কথাও খাটে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জীবনীর উপর লেখা বিখ্যাত বইগুলোতে এ ধররেনর গোঁজামিল নেই। সীরাত বা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জীবনীর লেখা রাহীকুল মাখতূম যা রাবেতাতুল 'আলামীয়ার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠতম বই হিসাবে বিবেচিত তাতে এ রুহানী তত্ত্বের কথা নেই। এ সব 'আকীদাঃ সূফী ও পথভ্রষ্ঠ দলের 'আকীদাঃ।

মহানবী বইয়ের মধ্যে যে সব প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা মুসলিম সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন প্রার্থনা সারলেন, স্বর্গ–মত্য, আধ্যাত্মিক পুরুষ, স্বগীয় অনুপ্রেরণা, মানবরূপী মুহাম্মদ, হযরতের স্বর্গে আরোহণ ইত্যাদি আরও অনেক শব্দ। যুধিষ্ঠির স্বর্গে আরোহণ আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র আকাশে আরোহণ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ বইয়ের ভাষা, ভাব, উপস্থাপনা বর্ণনা ইত্যাদি কারণে বইটি পাঠ্যেপযোগী নয়। সচেতন মুসলিম সমাজ এ বই থেকে সাধান থাকা উটত। এ বইটি মুসলিমদের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং ডঃ ওসমান গণীর Ph.D & D. Lit ডিগ্রির জন্যও বেমানান।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে তাঁর সিফাতে যাত (নিজস্ব সত্ত্বা) এবং গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তার নিজস্ব সত্তার বর্ণনায় তার হাত, পা, মুখ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্রোধ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিনে জান্নাতবাসীগণ আল্লাহর দর্শনলাভে ধণ্য হবেন এ কথা সাহীহ হাদীছে বর্ণিত আছেঃ সুতরাং আল্লাহর প্রতি আমরা নিরাকরত্বের ধারণা করতে পারি না। এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান– এ ধারণাও ইসলামবিরোধী। (তিনি যে 'আরশের উপরে..... তা পরের অধ্যায়ে আলোচিত)

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে তার সিফাতে যাত (নিজস্ব সত্ত্বা) বর্ণনায় তাঁর যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত মু'মিনের 'আকীদাঃ। এসব আকার বা গুণাবলীর কোন প্রকার সাদৃশ্য, রূপান্তর, ধরন ব্যাখ্যা ও বিকৃতি করা যাবে না। আর তা করা হলে প্রত্যেকেই তার নিজ খেয়াল-খুশী বা বুদ্ধি-বিবেচনা মুতাবেক করতে থাকবে; ফলে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা হবে, রূপান্তরিত হবে এবং হবে বিকৃতি। তাই এ ব্যাপারে 'আলেমগণ বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সিফাতের তাফসীরের ব্যাপারে তাফসীরকারীগণ কোন প্রকার ব্যাখ্যা, বিকৃতি, সাদৃশ্য, ধরন, বিবর্তন পরিবর্তন, রূপান্তর, বা বাষাগত রূপকার্থ পরিহার করে মুলভাব অনুযায়ী তাফসীর করার নীতি গ্রহণ করেছেন। এটাই আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'তের মূল উসূল। ইসলামেরর নামে প্রচলিত কিছু অ-ইসলামী বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা পাক-ভারত উপমহাদেশের সমাজে প্রচলিত তা প্রকৃত ইসলামী 'আকীদার পুরোপুরি বিরোধী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় ধর্মের বহু বিশ্বাস, রসম ও রেওয়াজ চোরা পথে ইসলামী সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে সেগুলো ইসলামী 'আকীদার রূপ পরিগ্রহ করে। লোকে সেগুলোই ইসলামী 'আকীদাঃ মনে করে তা বিশ্বাস করতে অব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ মুসলিম এ ব্যাপারে অজ্ঞ। বহু 'আলেমও এ ধরণের বিশ্বাস/'আকীদার সঠিক তথ্য জানে না। *আল্লাহ নিরাকারএবং সর্বত্র বিরাজমান* - এ ধারণাটা পুরোপুরি ইসলামবিরোধী। সঠিক ইসলামী 'আকীদাঃ হলো ঃ আল্লাহ নিরাকর নন, সর্বত্র বিরাজমানও নন। তবে **'তাঁর 'ইলম (জ্ঞান) সর্বত্রই।"**

আল্লাহর নিজস্ব সত্ত্বা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও গুণাবলী কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত। তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা জাযেজ নয় এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা চলবে না। যেভাবে আল্লাহ নিজের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল এ সম্বন্ধে যা বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোন সৃষ্টবস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য নেই। সেই অসীম সত্তার ধারণা আমাদের সসীম জ্ঞানের বহু উর্দ্ধে সীমিত কল্পনার অতীত, বুদ্ধি-বিবেচনার অগর্ম্য।

সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামী 'আকীদাঃ বা বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহর আকার বা নিরাকারত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমরা আল্লাহর নিজস্ব সত্তা এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তার আগে সে সব সত্ত্বা বা গুণাবলীর উসূল জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইমামদের উদ্ধৃতি প্রণিধাণযোগ্য:

ইমাম আ'জম আবূ হানীফাঃ (রঃ) বলেন:

((وله يد وَوجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن ، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ، ولا يقال إن يده قدرته أو

نعمته لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال ، ولكن يده صفته بلا كيف ، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف))

انظر: الشرح الميسر للفقه الاكبر المنسوب إلى ابي حنيفة رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه صـ ٤٢

এবং তাঁর (আল্লাহর) হাত, মুখ ও আত্মা আছে যেমন আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মধ্যে যা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে হলো ঃ মুখমন্ডল, হাত এবং আত্মা। আর এগুলো হলো তাঁর গুণবলী কিন্তু তাঁর কোন কাইফ (ধরন বা সাদৃশ্য) নেই; এটা যেন না বলা হয় যে তাঁর হাত হলো কুদরত বা তাঁর নিয়ামত আর এভাবে বলা হলে তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়- এটা কাদেরীয়াঃ ও মু'তাযিলাদের উক্তি বা বিশ্বাস। তাঁর হাত তাঁরই গুণাবলীর অংশ যার কোন কাইফ নেই। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি-দুটি বিশেষ গুণাবলী- আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম যার কোন কাইফ নেই। ১

আল্লাহর গুণাবলী বা সিফাত বর্ণনা করতে ইমাম মালেক যা বলেন তা পরবর্তী কালে সকলেই তা কায়েদাঃ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর বিশেষ সিফাত বা অবস্থা الاستواء বা উর্দ্ধে আরোহন সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন ঃ

(الاستواء غير مجهول ، وكيف غير معقول ، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة) انظر : العقيدة الصافية صـ ٣٥٣ نقلا عن (لمعة الاعتقاد لهادي إلى سبيل الرشاد) ابن قدامة المقدسي .

আল-ইসতিওয়া الاستواء / উর্দ্ধে আরোহন (আমাদের কাছে) অজ্ঞাত নয়, তবে তার কাইফ অর্থাৎ ধরন বা স্বরূপ জ্ঞানের অতীত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'য়াঃ। ২

ইমাম শাাফে'য়ী বলেন ঃ

((آمنت بالله ، وبما جاء عن الله ، على مراد الله ، وأمنت برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وبما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، على مراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم))

انظر:العقيدة الصافية صـ ٣٣٥ لسيد سعيد عبد الغني.

---

১. ইমাম আবূ হানীফার কিতাব ফিকহুল আকবারের শারহ, ডঃ মুহাম্ম দ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস ; পৃষ্টা ২৪, ছাপা সা'য়ুদী 'আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়, রিয়াদ।

২. আল-আকীদা আস-সাফীয়াঃ, পৃষ্টা- ৩৩৫, লেখক সাইয়্যেদ আব্দুল গানী।

আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ থেকে যা এসেছে এবং আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রতি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বুঝিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম।
ঈমাম শাাফে'য়ী আরও বলেন ঃ

((لله تعالى أسماء وصفات لا يَسَعُ أحدٌ قامت عليه الحجة ردها ، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ،فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ، ولا بالرَّوِيَّة والفكر ، ويُثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه : ﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ (سورةالشورى-

١١) العقيدة الصافية ، ص- ٣٣٥ .

আল্লাহ তা'য়ালার যে সব নাম ও গুণাবলী আছে যা দালীল দ্বারা প্রমাণিত তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কারুর নেই। এসব গুণাবলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও কেই বিরোধিতা করলে সে কাফের হয়ে যাবে। দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং হওয়ার পুর্বে কেউ অস্বীকার করলে জিহালত বা অজ্ঞতার কারণে সে ক্ষমারযোগ্য কেননা এ বিষয়ে জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য, গবেষণা ও চিন্তার অতীত। এসব গুণাবলী প্রমাণিত এবং এসবের কোন সাদৃশ্য করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নহে, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাঃ আশ-শুরা, আয়াঃ ১১)
ইমাম যাহাবী বলেন ঃ ইমাম মালেক, সুফইয়ান আস-সাওরী, লাইছ ইব্ন সা'দ, ইমাম আওযা'য়ী ইত্যাদি ইমামদের মত হলো যে সব হাদীছে আল্লাহর সিফাত বর্ণিত হয়েছে যা সাহীহ হিসাবে প্রমাণিত তার ফাইফ বর্ণনা ব্যতীত বহল রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে।
ইমাম আজুররী বলেন ঃ এ ধরনের সকল প্রকার হাদীছের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য কিন্তু এ হাদিছ সম্পর্কে কেমন, কেন, কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্ন করা ঠিক নয় বরং যেভাবে সেগুলো আমাদের কাছে এসেছে সেভাবেই তা বিশ্বাস করেতে হবে; কোন প্রকার চিন্তা ও গবেষণা করা চলবে না কেননা সকল 'উলামায়ে কেরাম এ ধরনের হাদীছ গ্রহণ করেছেন, ঈমান এনছেন যেমন ভাবে আমাদের কাছে এসেছে।
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বলেন:

((أن الله يَنزلُ إلى السماءِ الدنيا)) ، ((إن الله يُرى في القيامة)) وما أشبه هذه الأحاديث : نؤمن بها ، ونصدق بها ، لا كيف ، ولا معنى ، ولا نردّ شيئا منها ، ونعلم أن ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه و سلم) حقٌّ ، ولا نرد على رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ولا نَصِفُ الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا غاية ﴿ لَيۡسَ

كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ونقول كما قال ، ونؤمن بالقرآن كله ، محكمة ومتشابهة ، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ، ولا نتعدَّى القرآن والحديث ، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وتثبيت القرآن)) العقيدة الصافية ، ص– ٣٣٥ .

((আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন)), ((কিয়ামতের দিনে আল্লাহকে দেখা যাবে)) - ধরনের যত হাদীছ আছে - তাতে আমরা ঈমান আনি, তা বিশ্বাস করি, তার কোন কাইফ (ধরন বা স্বরূপ) নেই, তার অন্য কোন অর্থ নেই। এ সবের কোন কিছু প্রত্যাখান করি না। আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসছেন তা হাক বা সত্য এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কোন কিছুকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহ নিজেকে বা তাঁর সত্বা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার অধিক আমরা অনর্থক বর্ণনা করি না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাঃ আশ-শুরাঃ, আয়াঃ ১১)। তিনি যেমন বলেছেন আমরাও তেমন বলি। আমরা সম্পূর্ণ কুরআনের উপর ঈমান আনি– সুস্পষ্ঠ এবং অস্পষ্ঠ আয়াতসমূহে আমাদের ঈমান সুদৃঢ়। কুরআনের সিফাতের কোন এক সিফাতকে অস্বীকার করব না। কুরআন ও হাদীছের সীমা অতিক্রম করব না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সত্যায়ণ এবং কুরআনের প্রামাণিকতা ছাড়া কুরআনের হাকীকাতের কাইফ (স্বরূপ বা ধরন) জানি না। ১

ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কথার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কুদামাঃ বলেন ঃ

((وعلى هذا دَرَجَ السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم ، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم))

সালফে সালেহীন এবং পূর্ববর্তী সকল ইমামগণ (আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন) –এ পদ্ধতিতেই তারা চলেছেন বা বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সুন্নাতের মাধ্যমে যে সব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তার স্বীকৃতি, বহাল, প্রমাণ ও বাস্তবায়নে তারা সকলেই একমত পোষণ করেন।

---

১. আল-আকীদাঃ অস-সাফীয়াঃ, পৃষ্ঠা - ৩৩৫, সাইয়্যেদ সায়ীদ আব্দুল গণী।

আবুল কাসেম আল্লালকায়ীর কিতাব থেকে তার কথা উল্লেখ করে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়াঃ (রঃ) বলেন ঃ ইমাম আবু হানীফার সাথী মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন ঃ পৃথিবী সকল ফুকাহারা একমত যে কুরআন ও হাদীছে যেসব আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কোন বর্ণনা, ব্যাখ্যা রূপান্তর, সাদৃশ্য ব্যতীত বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি কোন প্রকার ব্যখ্যা বা বর্ণনা করল সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র তারীকাঃ এবং আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতের তরীকার খেলাপ করল যেহেতু তারা কোন প্রকার ব্যখ্যা বা বর্ণনা দেন নি।

ইমাম ইবনে তাইমীয়াঃ বলেন ঃ

((أمّا ما قاله الشافعي فإنه حقٌّ يجب على كل مسلم اعتقاده ، ومن اعتقاده ولم يأت بقولٍ يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا و الآخرة))

(شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس – صـ٣٣، و العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية .

ইমাম শাফে'য়ী যা বলেন তা সত্য; প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব এবং এর বিরোধী কোন কথা না বলার উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে তাহলে সে দুনিয়া ও আাখেরাতে নিরাপদ পথে পরিক্রমা করল।

তিনি আরও বলেন :

و من الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسولـه (صلى الله عليه و سلم)، من غير **تحريف** ولا **تعطيل** ، ومن غير **تكييف** ولا **تمثيل**، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো ঃ আল্লাহ তার সম্মানিত কিতাবে সেভাবে নিজেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল সেভাবে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। কোন প্রকার বিকৃতি, নিরর্থক, ধরন এবং সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে কেননা কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (সূরাঃ আশ-শুরা, আয়াঃ ১১) মোট কথা ঃ আমাদের পূর্ববতী ও পরবতী সকল বিজ্ঞ ইমাম ও 'উলামাদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সিফাত সম্পর্কীয় কুরআনের আয়াত এবং সাহীহ হাদীছের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এবং এ সবের কোন প্রকার ব্যখ্যা, বিকৃতি, প্রতিকৃতি ও উপমা দেয়া ব্যতীতই তা প্রহণ করতে হবে।

আসমা ওয়াস সিফাতের ব্যপারে এটাই ছিল সালফ সালেহীনদের তারীকাঃ। ১

---

১. শায়খল ইসলাম ইবন তাইমীয়ার আল-আকীদাঃ আল- ওয়াসাাতিয়াঃ ঃ- শারহ আল-আকীদাঃ আল-ওয়াসাাতিয়াঃ - আল্লামা মুহাম্ম দ খালীল হারতাস, পৃষ্ঠা - ৩৩।

(আল্লাহর মুখমন্ডল)

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে নিজের ---বা মুখমন্ডলের কথা বর্ণনা করেন।

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورةالبقرة-١١٥)

এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই, অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফেরাও যে দিকেই **আল্লাহর মুখমন্ডল,** আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ১১৫)

উপরোক্ত আয়াতে **وَجْهُ ٱللَّهِ** / তর্জমায়য় আল্লাহর মুখমন্ডল এর পরিবর্তে আল্লাহর দিক তর্জমাঃ করেছেন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডঃ ওসমান গণী ও মাওলানা মোবারক করীম জওহর (কলিকাতা)। মাওলানা মুহীউদ্দীন খান তর্জমাঃ করেছন ঃ **আল্লাহ বিরাজমান**। আব্দুল মাতীন সালাফী সম্পাদিত তর্জমায় লিখেছেন **আল্লাহ বিরাজমান।** ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ **ঈশ্বরের আনন**। ইংরেজী তর্জমায় ঃ 'আব্দুল্লাহ ইউসূফ আলী ঃ To Allah belong the East and the West; and whithersoever ye turn, there is **Allah`s face** (আল্লাহর মুখমন্ডল)। পিকথলকৃত তর্জমাঃ ঃ Unto Allah belong the East and the West, and whithersoever ye turn, there is **Allah`s Countenance** (আল্লাহর মুখমন্ডল)। ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান ও ডঃ তাীউদ্দীন হিলালীকৃত তর্জমাঃ And toAllah belong the east and the west; so wherever you turn Yourselves or your faces there is the **Face of Allah** (আল্লাহর মুখমন্ডল)। অন্যান্য ইংরেজী তর্জমায় **Face of Allah** (আল্লাহর মুখমন্ডল)। তর্জমাঃ করা হয়েছে।

সব কিছুরই ধ্বংসশীলতা ও নশ্বরতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾ (سورة الرحمن)

ভূপৃষ্ঠে সব কিছুই নশ্বর। এবং তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল'ই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (সূরাঃ আর-রাহমান ২৬-২৭)

উপরোক্ত আয়াতে **وجه ربك** তর্জমায় তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল এর পরিবর্তে তোমার প্রতিপালকের সত্তা তর্জমাঃ করছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডঃ 'ওসমান গণী ও মাওলানা মোবারক করীম জওহর (কলিকাতা)। মাওলানা মহিউদ্দীন খান তর্জমাঃ করেছেন ঃ আপনার পালনকর্তার সত্তা।

আব্দুল মাতীন সালাফী সম্পাদিত তর্জমায় লিখেছেন ঃ আপনার পালনকর্তার সত্তা। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ তোমার প্রতিপালকের আনন।
ইংরেজী তর্জমায় ঃ 'আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ঃ All that is on earth will perish. But will abide (for ever) the **face of thy Lord...** (তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল)। পিকথলকৃত তর্জমাঃ Everyone that is thereon will pass away; there remaineth but the **Countenance of thy Lord** (তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল)। ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান ও ডঃ তাকীউদ্দীন হিলালীকৃত তর্জমাঃ Whatsoeve is on it (the earth) will pwrish. And the **Face of your Lord** (তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল)। অন্যান্য ইংরেজী তর্জমায় ঃ **Face of your Lord** (তোমার প্রতিপালকের মুখমন্ডল) তর্জমা করা হয়েছে।

﴿ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ﴾ (سورة القصص– ٨٨)

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।
(সূরাঃ আল-কাসাস, আয়াঃ ৮৮)।

উপরোক্ত আয়াত وَجْهَهُ তর্জমায় তাঁর মুখমন্ডল এর পরিবর্তে আল্লাহর সত্তা তর্জমাঃ করেছেন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডঃ ওসমান গণী ও মাওলানা মোবারক করীম জওহর (কলিকাতা)। মাওলানা মহীউদ্দীন খান তর্জমাঃ করেছেন আল্লাহর সত্তা । আব্দুল মাতীন সালাফী সম্পাদিত তর্জমায় লিখেছেন ঃ তাঁহার সত্তা। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ তাঁহার সরূপ।
ইংরেজী তর্জমায় : 'আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী : There is no god but He. Everything (that exists) will perish except His Face (তাঁর মুখমন্ডল)। পিকথলকৃত তর্জমাঃ : There is no god save Him. Everything will perish save **His Countenance** (তাঁর মুখমন্ডল)। ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান ও ডঃ তাকীউদ্দীন হিলালীকৃত তর্জমাঃ : None has the right to be worshipped but He. Everything will perish save **His Face** (তাঁর মুখমন্ডল)। অন্যান্য ইংরেজী তর্জমায় **ঐরং Face** (তাঁর মুখমন্ডল) তর্জমাঃ করা হয়েছে। * (পরের পৃষ্ঠায় বিশেষ জ্ঞাতব্য দেখুন)

হাদীছেও বণীত আছে :
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'য়া করার সময় বলতেন ঃ
كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول ((أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ...)) (البخاري)
তোমার মুখমন্ডলের দোহাই দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি...। ১
অন্য হাদীছেও বর্ণিত :

إن النبي (صلي الله عليه وسلم) كان يقول في دعائه ((... وَأَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلى لِقَائِكَ ...)) (رواه النسائي و أحمد)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু‘য়া করার সময় বলতেন ঃ তোমার মুখমন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাতের সুখস্বাদ অনুভব করে তোমার সাথে সাক্ষতের আকুল আকাঙ্খা নিয়ে প্রার্থনা করছি। ২

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

* বাংলা ভাষার তর্জমাঃ আর ইংরেজী তর্জমার পার্থক্য লক্ষণীয়। ইংরেজী তর্জমায় কোন প্রকার তায়ীল করা হয় নি যা যথার্থ কিন্তু বাংলা তর্জমায় তায়ীল করা হয়েছে যা সঠিক নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়লাদেশের যে সমস্ত ‘আলেমগণ তর্জমাঃ করেছেন সকলেই হানাফী মাযহাবের লোক এবং মহীউদ্দীন খানও একজন হানাফী ‘আলেম কিন্তু তাদের তর্জমায় ইমাম আবু হানীফার উসূল অনুসরণ করা হয় নি। আব্দুল মাতীন সালাফী তার স্বনামেই বিখ্যাত অর্থাৎ সালাফীপন্থী। তিনি যে তর্জমাঃ করেছেন তা সালাফী ‘আকীদাঃ মুতাবেক নয় বরং আশা‘য়েরাদের মতই তায়ীল হয়েছে। আব্দুল মাতীন নিজে সালফী মতাবলম্বী হয়েও কেন মুকাল্লীদদের তাকলীদ করলেন?

* ইমাম আল-বুখারী তার কিতাব-কিতাবুত তাওহীদের মধ্যে আল্লাহর মুখ শব্দের কোন প্রকার তায়ীল বা ব্যখ্যা করেন নি। যেভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সেভাবে তিনি তা প্রহণ করেছেন। অনেক ইমামও এ মতের অনুসারী। আবার কোন কোন ইমাম বা ‘আলেমে দীন তায়ীল করেছেন।

---

১. আল-বুখারী - নং ৪৬২৮, ৭৪০৬, ৭৩১৩; আত-তিরমিযী, নং ৩০৬৫; আবু দাউদ, নং ৫০৫২; আহমদ, নং১০৯০৪।
২. আন-নাসায়ী - নং ১৩০৫-৬; আহমদ - নং ১৭৭৮৬১, ২১১৫৮, ২৬৫৯৫।
আত-তাফসীর আত-তাবারী, কিতাবুত তাওহীদ : ইবন মান্দাঃ ও ইবন খুযাইমাঃ।

(আল্লাহর সূরাত বা আকৃতি)

আল্লাহর সূরাত সম্পর্কে অনেক সাহীহ হাদীছ আছে, কিন্তু সূরাতের স্বরূপ নিয়ে ‘আলেমদের মধ্যে চরম মতভেদ আছে। সে সব হাদীছের ‘ইলমী বাহাছ ‘আলেমদের বোধগম্য। অপামর জনসাধরণ বা ‘আম মুসলিমের জন্য তা অপ্রয়োজীন্ তাই সে সবের উদ্ধৃতি না দিয়ে বর্তমান আরোচনার সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীছই উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহর সূরাত-দর্শন সম্পর্কে দীর্ঘ যে হাদীছ বর্ণিত আছে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকুরই উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ((... فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ...)) (رواه البخاري)

...কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহ তাঁর প্রকৃত সূরাতের পরিবর্তে অন্য সূরাতে তাদের সম্মুখে হাজির হবেন এবং বলবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতিপাল। তারা বলবে ঃ আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাদের এ স্থানে আমাদের মহান প্রতিপালক আসবেন এবং যখন তিনি এখানে আসবেন তখন তাকে আমরা চিনতে পারবো। তারপর আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর সেই সূরাতেই হাজির হবেন যে সূরাতে তারা তাঁকে চিনবে এবং বলবেন ঃ আমি তোমাদের রর/প্রতিপালক। তখন তারা বলবে ঃ আপনিই আমাদের রব/প্রতিপালক...১

নিন্মক্তে হাদীছটিও দীর্ঘ, তাই শুধু প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

((...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلي الله عليه وسلم) خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَدَاةٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ مُسْفِرُ الْوَجْهِ أَوْ مُشْرِقُ الْوَجْهِ . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ مُسْفِرَ الْوَجْهِ أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ .فَقَال وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ...))

(رواه البخاري)

---

১. আল-বুখারী - নং ৪৬২৮, ৭৪০৬, ৭৩১৩; আত-তিরমিযী - নং ৩০৬৫; আবু দাউদ - নং ৫০৫২; আহমদ - নং ১০৯০৪।

একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রফুল্লচিত্তে, উজ্জল ও স্বতঃস্ফুর্ত বদনে সাহাবীদের সম্মুখে হাজির হলেন। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে খুবই প্রফুল্লচিত্ত, উজ্জ্বল বদন এবং স্বতঃস্ফুর্ত দেখাচ্ছে! তিনি বললেন ঃ এ রকম হতে আর নিষেধ কী? মহান ও সম্মানিত আমার প্রতিপালক গতরাতে আহসানুল সূরাতে (সুন্দরতম সূরাত বা চেহরায়) আমার কাছে এসেছিলেন বা দেখেছি। ... (এ ঘটনা স্বপ্নাবস্থায় ঘটেছিল)। ১

নাবীদের স্বপ্ন ওহীরই অংশ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছেন- তাহলে প্রমাণিত যে আল্লাহ নিরাকার নন, কেননা নিরাকারকে দেখা যায় না। * তাঁর যে সত্তা তা **শ্বাশত, চিরন্তন ও অবিনশ্বর -যা ছিল, আছে ও থাকবে।** আল্লাহ তা'য়ালা নিজে তাঁর স্বরূপের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেন নি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর আকারের ব্যাপারে পূর্ণভাবে আমাদের জানান নি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নেই।

আবূ মুহাম্মদ ইবনে কুতাইবাঃ বলেন ঃ আল্লাহর সূরত সাব্যস্ত হওয়া কোন অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যেমন আল্লাহর দু-হাত, পা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সাব্যস্ত হয়েছে। তবে পার্থক্য হলো যে হাত, পা, আঙ্গুল, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ইত্যাদি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- তাই মানুষে সহজেই তা গ্রহণ করে কিন্তু আল্লাহর সূরাত সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা সহজে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে কিন্তু আমরা কোন প্রকার কাইফিয়াত (ধরন) ও বর্ণনা ব্যতীতই সকল প্রকার আসমা ও সিফাতে বিশ্বাস করব।

---

১. আল-বুখারী, নং - ৪৬৭৬,৭৪৪০; আত-তিরমিযী, নং - ৩২৩৩; আহমদ, নং - ৩৪৭৪, ২০৬০৫।

* জান্নাতবাসীগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে তাদের মারতবাঃ বা স্টান্ডার্ড অনুযায়ী। কেউ দেখবে সকাল-বিকালে কেউ দিনে একবার, কেউ সপ্তাহে একবার কেউ বা মাসে একবার। আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে কিয়ামতের দিনে; এ দুনিয়ায় নয় তাহলে তাঁর সত্তা নিরাকার হতে পারে না। নিরাকারকে দেখা যায় না। তবে তাঁর কোন কাইফ (স্বরূপ/ধরন) আমরা জানি না কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। বরং আল্লাহ বলেন ঃ কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। (সূরাঃ আশ-শুরা)

(আল্লাহর হাত)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ (سورة آل عمران– ٧٣)

বল – অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে। (সূরাঃ আলে-'ইমরান, আয়াঃ ৭৩)

আল্লাহ ইবলীসকে বলেন:

﴿ قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ ﴾ (سورة ص– ٧٥)

হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজ্‌দাঃ/সাজ্‌দাঃ করতে কিসে তোমাকে নিষেধ করলো। (সূরাঃ সাদ, আয়াঃ ৭৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন:

﴿ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ ﴾ (سورة المائدة – ٦٤)

বরং তাঁর (আল্লাহর) দু-হাতই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।

(সূরাঃ সাদ, আয়াঃ ৬৪)

আল্লাহর গৌরবময় হাত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে:

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ আদম ('আলাইহিস সালাম) কে ডাকবেন তখন জবাবে আদম ('আলাইহিস সালাম) বলবেন ঃ তোমার সন্তুষ্টির জন্য হাজির, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। ১

কিয়ামতের দিনে জান্নাতবাসীগণ যখন তাদের প্রতিপালককে ডাকবেন তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার সন্তুষ্টির জন্য হাজির, কল্যাণ তো তোমারই হাতে। ২

কিয়ামতের দিনে সকলে আদম ('আলাইহিস সালাম)'র কাছে এসে আল্লাহর কাছে শাফা'য়াতের জন্য আবেদনকরতঃ বলবে হে আদম! আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতে বাস করতে দিয়েছেন...। ৩

---

১. আল-বুখারী নং ৬৫৩০, ৩৩৪৮; মুসলিম নং ২০১।

২. আল-বুখারী নং ৭৫১৮।

৩. আল-বুখারী নং ৬৮৮৬; মুসনাদ আহমদ নং ২৪১৫, ২৫৭০।

অন্য হাদীসে বর্ণীত ঃ আাদম ('আলাইহিস সালাম) মূসা ('আলাইহিস সালাম) কে বললেন ঃ তুমিই সে মূসা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাত লেখে দিয়েছেন। ১

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ আল্লাহ নিজ হাতে তিনটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন ঃ আদমকে তার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, নিজ হাতে জান্নাতুল ফিরদাউস স্থাপন করেছেন এবং মূসাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন। ২

অন্য হাদীসে বর্ণিত ঃ ... তোমাদের প্রতিপালক তাঁর নিজ হাতে লিখেছেন ঃ আমার রাহমাঃ (রহমত/করুণা) আমার গাদবের (ক্রোধ) উপর প্রধান্য লাভ করেছে।৩

আল্লাহর হাতের পাঁচ আঙ্গুলেরও বর্ণনা আছে ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাছে এসে এক ইয়াহুদী বলল ঃ হে মুহাম্মদ কিয়ামতের দিনে আকাশমন্ডলীকে আল্লাহ তাঁর এক আঙ্গুলে রাখবেন, অন্য আঙ্গুলে সমস্ত বিশ্ব, পাহাড়সমূহ অন্য আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টবস্তু অন্য আঙ্গুলে রাখবেন। তারপর বলবেন ঃ আমি মহাধিপতি...। ইয়াহুদীর বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন হাসলেন যে তাঁর মাড়ীর দাঁত প্রকাশ হলো।
তারপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ ﴾ (سورة الأنعام – ٩١)

তারা আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা/কাদর নিরুপন করে নি। (সূরাঃ আল-আন'য়াম, আয়াঃ ৯১) ৪

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يطوي الله السماواتِ يوم القيامةِ، ثم يأخذُهن بيده اليُمنى ، ثم يقول : **أنا الملك، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون** ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله — وفي رواية : يأخذهن بيده الأخرى...)) (رواه مسلم)

---

১. আল-বুখারী নং ৭৪৩৮, ৭৪৪০ ; মুসলিম নং ১৮২ ; আহমদ নং ৭৮৭৬ ; ১০৫২৩।

২. আল-বায়হাকী নং ৩১৮; আদ-দারকুতনী নং ২৮ ও অন্যেরা।

৩. আল-বুখারী নং ৩৩৪০, ৪৪৭৬; মুসলিম নং ১৯৩, ১৯৪, ২৬৫৩; আত-তিরমিযী নং ২১৩৪, ৩৪৩৪; ইবনে মাজাঃ নং ৪১১৩ ও অনেকে।

৪. আল-বুখারী নং ৭৫৫৪; মুসলিম নং ২৭৫১।

‘আবদুল্লাহ বিন ‘উমর (রাদী আল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ আকাশমন্ডলীকে একত্রিত করবেন, তারপর সেগুলো ডান হাতে রাখবেন, তারপর বলবেন আমি মহাধিপতি! কোথায় ধর্পকারীগণ, কোথায় অহংকারীগন? তারপর পৃথিবীর/স্তরগুলোকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন। অন্য বর্ণনায় আছে অন্য হাতে রাখবেন...। ১

সাহীহ হাদীছের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর **আঙ্গুল, তালু, মুষ্টি, অঞ্জলি** ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে।

(আল্লাহর পা)

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন ঃ

﴿ يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴾ (سورة القلم)

কিয়ামতের দিনে আল্লাহর হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মোচিত করা হবে এবং সিজদাঃ/সাজদাঃ করার জন্য সকলকে আহবান করা হবে, কিন্তু তারা তা করতে সমর্থ হবেনা। (সূরাঃ আল-কালাম, আয়াঃ ৪২)

উপরোক্ত আয়াতে **سَاق** এর তর্জমায় **হাঁটুর নিম্নাংশ** এর পরিবর্তে **চরম সঙ্কট** ব্যবহার করেছেন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তবে ফুটনোটে হাঁটু পর্যন্ত পাও লিখেছেন। ডঃ ওসমান গাণী (কলিকাতা), তর্জমাঃ করেছেন ঃ যেদিন আবরণী হতে মুক্ত হবে (**পায়ের তলা** থেকে কাপড় তোলা হবে, সেই **চরম সঙ্কটের দিন**) ... ???। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (কলিকাতা), তর্জমাঃ করেছেন ঃ **চরম সংকটের দিন**...। মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সম্পাদিত তর্জমায় লিখেছেন ঃ **গোছা পর্যন্ত পা**...। আব্দুল মাতীন সালাফী সম্পাদিত তর্জমায় লিখেছেন ঃ **চরম সঙ্কট দিবস**...।

ইংরেজী তর্জমায় ‘আব্দুল্লাহ ইউসুফ ‘আলী : The Day that **the Shin** (হাঁটুর নিম্নাংশ) shall be laid bare... পিকথলকৃত তর্জমাঃ : On the day **when it befalleth in earnest** (?) ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান ও ডঃ তাকীউদ্দীন হিলালীকৃত তর্জমাঃ (Remember) the Day when **the Shin** (হাঁটুর নিম্নাংশ) ফুটনোটে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য ইংরেজী তর্জমায় **the Shin** (হাঁটুর নিম্নাংশ) বলা হয়েছে।

বাংলা ও ইংরেজী তর্জমার পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

---

১. আল-বুখারী নং ৩১৯৪; আহমদ নং ৮৪৮৫, ২৭৩৪৩।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে:
আব্দুল মাতীন সালাফীর সম্পাদীত তর্জমাঃ অপ্রত্যাশিত কেননা তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন 'আলেম। সেখানকার সব উস্তায স্যাক শব্দের অর্থ হাঁটুর নিম্মাংশ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং ও প্রচার দফতর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে প্রকাশিত কুরআন ও কুরআনের তাফসীর ঃ আত-তাফসীর আল-মুয়াস্সির যা সমস্ত তাফসীরের নির্যাস। তাফসীর জগতে এক সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য সংযোজন। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে নিম্মোক্ত হাদীস অনুযায়ী তাফসীর করা হয়েছে।

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ((**يكشف ربنا عن ساقـه** فيسجد لـه كل مؤمن و مؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء و سمعة ، فيذهب ليسجد ، فيعود ظهرُهُ طبقا واحداً)) (متفق عليه)

আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী (রাদী আল্লাহু 'আনহু) বলেন যে আমি রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি : আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) কিয়ামতের দিনে **তাঁর হাঁটুর নিম্মাংশ** প্রকাশ করে দেবেন, প্রত্যেক মু'মিন, ম'মিনাঃ তাতে সিজ্দাঃ করবেন এবং সে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক-দেখান ও সম্মানের জন্য তা করত সে সিজ্দাঃ/সাজ্দাঃ করতে গেলে তার পিঠ সমান হয়ে ফিরে আসবে (বা সিজ্দাঃ করতে সমর্থ হবে না)। ১

ডঃ 'উমর সুলায়মান আল-আশাকার তার বিখ্যাত কিতাব ঃ 'আকীদাঃ ফীল্লাহ (عقيدة في الله) তে বলেন ঃ

وينبغى أن ننبه هنا إلى أن إثبات الساق لله كإثبات اليد والسمع والبصر وغيرها من الصفات ، وما ورد عن ابن عباس أنه فسر كشف الساق بمعنى شدة الأمر معارض بما ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقـه .

---

১. আল-বুখারী নং ৬৬৬১; মুসলিম নং ২৮৪৮; আত-তিরমিযী নং ৩২৭২; আহমাদ নং ১১৯৭২, ১২০৩২, ১২৭৮৯, ১৩০৪৫।

আল্লাহর স্যাক/ ساق বা হাঁটুর নিম্মাংশ প্রমাণ করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া অবশ্য কর্তব্য কেননা তা আল্লাহর হাত, শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য সবই তাঁর সিফাত বা গুণাবলী মতই। ইবন 'আব্বাস থেকে প্রমাণিত যে তিনি **كشف الساق**এর তাফসীর করেছেন **কঠিনাবস্থা বা সংকটময় পরিস্থিতি**- এব বিপরীতে ইবন মাস'য়ূদ থেকে প্রমাণ হয় ঃ (**يكشف ربنا عن ساقه**) আমাদের প্রতিপালক **তাঁর হাঁটুর নিম্মাংশ প্রকাশ করবেন।**

وقد أورد ابن جرير الطبري وابن كثير تفسير ابن عباس كما أوردا رويات الحديث المفسر للنص القرآني ، ولم يؤولا الحديث بحمله على غير ظاهره مما يدل على أنه لا تعارض عندهما بين الحديث وكلام ابن عباس ، فإن الأمرشديد في يوم القيامة ، ولا ينافي هذا أن يكشف عن ساقه .

ইবন জারীর আত-তাবারী ও ইবন কাসীর তাদের তাফসীরের মধ্যে কুরআনীয় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন 'আব্বাসের তাফসীর উল্লেখ করেছেন কিন্তু হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে বিকৃত করে পরিবর্তন করেন নি এতে প্রমাণিত হয় যে তাদের কাছে হাদীসের শব্দ ও ইবন 'আব্বাসের কথার মধ্যে কোন বেপরিত্য পরিলক্ষিত হয় নি; কেননা কিয়ামতের দিনের অবস্থা **খুবই সংকটজনক হবে** এবং সেদিন **আমাদের প্রতিপালক তার হাঁটুর নিম্মাংশ উম্মোচিত করবেন**। এ কথা দুটোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

আনাস (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জাহান্নামে যতই জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে ততই সে বলতে থাকবে আরও অতিরিক্ত আছে কি? আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের উপর তাঁর **কাদম**/পা রাখবেন তখন জাহান্নাম বলবে : যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে...। ১

---

১. আল-বুখারী - নং ৪৯১৯, ৭৪৪০; মুসলিম - নং ১৮৩।

(আল্লাহর দর্শন)

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (سورة القيامة ٢٢-٢٣)

সেদিন কোন কোন মুখ হবে উজ্জল। তারাই হবে তাদের প্রতিপালকের দর্শনকারী। (সূরাঃ আল-কিয়ামাঃ, আয়াঃ -২৩)

وعن جرير بن عبد الله (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ عَيَاناً)) (متفق عليه)

জারীর বিন 'আবদুল্লাহ (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের রব/প্রতিপালককে তোমরা (পরকালে) **চাক্ষুসভাবে দেখবে**। ১

وفي رواية : قال : كنا جلوسا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال ((إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَونَ هَذا الْقَمَر لا تَضَامُونَ فِيْ رُؤيَتِهِ)) (متفق عليه)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাছে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমাদের রব/ প্রতিপালককে অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে যে রকম দেখতে পাচ্ছ এ চাঁদকে, যা দেখতে অন্যের সহযোগিতার দরকার হয় না।২

অন্য হাদীসে উল্লেখিত:

وعن صهيب (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ((إِذاَ دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعالَى : ﴿ **تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيْدُكُم** ﴾ ؟ فَيَقُولُون : أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنْجِيْناَ مِنَ النَّارِ؟ قال ((فَيُرْفَعُ الحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ الله، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ)) ثُمَّ تَلاَ ﴿ **لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ** ﴾ (رواه مسلم)

---

১. আল-বুখারী - নং ৭৪৬৫, আরও অনেক স্থানে।
২. আল-বুখারী - নং ৫৫৪, ৮৪৩৬; আল-মুসলিম - নং ৬৬৩; আত-তিরমিযী - নং ২৫৫৪।

সুহাইব (রাদী আল্লাাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত : নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন : তোমরা কি চাও যে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেই? তারা তখন বলবে : আপনি কি আমাদের মুখোজ্জল করেন নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন নি? নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তখন পর্দ্দা উঠিয়ে দেয়া হবে আর তারা আল্লাহর মুখ দেখবে্ তাদের প্রতিপালকের দিকে দুষ্টিপাতের চেয়ে অধিক কোন প্রিয়তর জিনিষ তাদেরকে দেয়া হয় নি। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ যারা মঙ্গালজনক কার্য করে তাদের জন্য আছে মঙ্গাল এবং আরও অধিক। ১

মুসলিম শারীফের হাদীসে উল্লেখ আছে : আল্লাহর দর্শনই জান্নাতীদের কাছে সব থেকে সুখকর ও আনন্দদায়ক হবে। ২

মুসলিম শারীফের অন্য হাদীসে উল্লেখিত : মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য দেখতে যেমন কোন কষ্ট হয় না অনুরূপভাবে মু'মিনগণ কিয়ামতের দিনে আল্লাহকে স্বচ্ছন্দে দেখতে পাবে। ৩

অন্য হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত : মেঘমুক্ত মধ্য আকাশে সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদের মতোই জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ তা'য়ালার মুখমন্ডল দর্শন করবে। ৪

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে সাহাবীদের মধে মতভেদ ছিল। ইবন 'আব্বাস (রাদী আল্লাহু 'আনহু)'র মতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে দেখেছেন। 'আয়েশাঃ (রাদী আল্লাহু 'আনহা) বলেন : যে দাবী করে যে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে দেখেছে সে আল্লাহর উপর বড় ধরনের জালিয়াতী করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু-বার জিবরীলকে তার আসল রূপ বা সূরাতে দেখেছেন কিন্তু আল্লাহকে দেখেন নি। অধিকাংশ 'উলামাদের কাছে এ মতই সঠিক।

মিরাজের ঘটনায় দেখা যায় : জিবরীল বাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উর্ধ্বাকাশে আল্লাহর নিকটে পৌঁছুলে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সৃষ্টির রহস্য, সাত আসমানে বহু নাবীদের সাথে সাক্ষাত করিয়েছিলেন এবং শেষে আল্লাহর সাথে কথপোকথন হয়েছিল . . . কিন্তু সাক্ষাত হয় নি।

---

১. মুসলিম - নং ১৮১; আত-তিরমিজী - নং ২৫৫২; ইবন মাজাঃ - নং ১৮৭; ও আহমদ।
২. আল-বুখারী - নং ৫৫৮, ৫৮৩, ৮৪৩৬; মুসলিম - নং ৬৬৩; আত-তিরমিযী - ২৫৫৪।

মূসা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখতে চাইলে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ ﴾ (سورة الأعراق – ١٤٣)

যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালকের সাথে কথা বললেন ঃ হে আমার রাব/প্রতিপালক আমাকে দর্শন দাও তোমাকে আমি দেখব। তিনি বললেন তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি তা স্বস্থানে অবিচল থাকে তহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতির বিকিরণ করলেন তখন তা পাহাড়কে চুর্ণবিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে বলল : তোমারই মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করি! তোমার কাছেই তাওবা করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াঃ - ১৪৩)

হিন্দুধর্ম মতে ঃ কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দান করেছিলেন যা গীতায় লিপিবদ্ধ। ১১ অধ্যায়ে শ্লোক ৩ ও ৪ - এ উল্লেখিত।

এবমেতদ যথাত্থ ত্বমাত্মাং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তো রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তাম।। ৩।।

অনুবাদ: (অর্জুন বললেন) হে পুরুষোত্তম, তুমি যে আত্মতত্ত্ব বলেছ তা যথার্থ কিন্তু তা সত্বেও হে পরমেশ্বর , তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, তা তোমার সেই ঐশ্বরীয় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দুষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম।। ৪।।

অনুবাদ ঃ হে প্রভু যদি তুমি মনে কর যে আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই জগতাত্ম রূপ দেখাও।

গ্রীভগবানুবাচ
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
উনাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ।। ৫।।

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বললেন: হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন মুর্তি দর্শন কর। ১
এভাবে ৪৮ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং অর্জ্জুন সচক্ষে সে মোহণীয় রূপ দর্শন করে ধন্য হলেন।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣ ﴾ (الأنعام – ١٠٣)

দৃষ্টিশক্তি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না বরং তিনিই দৃষ্টিশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সূক্ষ্যদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরাঃ আন-'আাম, আয়াঃ - ১০৩)
আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের ধারণা বিপরীত। 'আকীদার বা বিশ্বাসের ব্যাপারেও চরম বৈপরীত্য বিদ্যমান।
এ দুনিয়াতে কোন সৃষ্টিবস্তু সেই মহান সত্তাকে দেখতে সমর্থ হয় নি, হবেও না। তবে কিয়ামতের মাঠে জান্নাতবসীগণ আল্লাহকে সচক্ষে দেখতে পাবে যা হবে তাদের পরম সুখ ও চরম আনন্দ - এ কথা সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে, আকার আছে এবং কিয়ামতের দিনে তাঁকে সুস্পষ্ঠভাবে দেখা যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে স্বপ্নের মাধ্যমে আহসানুল সূরাতে অর্থাৎ সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছেন কিন্তু সে আকারের বর্ণনা দেন নি। তাহলে তিনি নিরাকার নন কেননা নিরাকারকে দেখা যায় না। তাঁর সে সত্তা তা স্বাশত, চিরন্তন ও অবিনশ্বর - যা ছিল, আচে ও থাকবে। তবে কি তিনি সাকার? তাঁর কি কোন রূপ আছে? এর উত্তরে বলা যায় : কুরআন ও হাদীছে আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন হাত, তালু, মুষ্টি, অঞ্জলী, পা, মুখ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, সূরাত ইত্যাদি উল্লেখিত হলেও তাঁর নির্দিষ্ট বা বিশেষ কোন আকারের বর্ণনা নেই। কোন বিশেষ আকারে সেই মহান সত্তার বর্ণনা করার আমাদের অধিকার নেই কেননা কুরআন ও হাদীছে এ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। জাহামীয়াঃ ফিলকাঃ মতালম্বী যারা আল্লাহর আকারের কল্পনা করে থাকে তাদেরকে মুজাস্সিমীন বলা হয় এবং তারা আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামায়াতের বহির্ভূত। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে, অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে; তবে তার কাইফ (স্বরূপ/ধরন) আমরা জানি না। ইমাম আবূ হানীফাঃ এবং ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ইমামদের উক্তিই যথেষ্ঠ।

---

১. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ- পৃষ্ঠা ৫১৭; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কত্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ: শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ভারত।

আল্লাহর আকার বা অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ী করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা চলবে না। যেভাবে আল্লাহ নিজের বর্ণনা করেছেন এবং তার রাসূল এ সম্বন্ধে যা বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এবং আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে তিনি ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেন নি সে সম্বন্ধে কোন কল্পনা বা কিয়াসও চলবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ (سورة الشورى- ١١)

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাঃ আশ-শূরা, আয়াঃ **১১**)

সেই অসীম সত্তার ধারণা আমাদের সসীম জ্ঞানের উর্ধ্বে, সীমিত কল্পনার অতীত, বুদ্ধি-বিবেচনার অগম্য।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়াঃ তার বিখ্যাত কিতাব আল-আকীদাঃ আল-ওয়াসাতীয়াঃ'র মধ্যে বলেন: আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাস ও মতবাদ হলো মধ্যপন্থী।

.....بل هم الوسط في فرق الأمة, كما أن الامة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالي بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية و القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة[بين] الوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب [أسماء] الإيمان والذين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية , وفي أصحاب رسول الله بين الرفضة و [بين] الخوارج.

আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জাম'য়াঃ মধ্যবতী পথ ও মতের অনুসারী। তারা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে আহলুত তা'তীল অর্থাৎ জাহমীইয়াঃ ও **আহলুল তামছীল (মুশাব্বাহদের)** বিশ্বাসের মধ্যপন্থী বা আধিক্যহীন। আল্লাহ কর্তৃক কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে **জাবরীয়াঃ** ও **কাদেরীয়াদের** মধ্যে তারা মধ্যপন্থী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে **মুরজিইয়াঃ ও কাদেরীয়াদের ওয়াঈদীয়া ফিরকাঃ** বা অন্য দলের মধ্যে তারা মধ্যপন্থী। ঈমান ও দীনের ব্যাপারে তারা **হুরুরীয়াঃ** ও **মু'তাজিলাঃ** এবং **মুরজিইয়াঃ** ও **জাহমীইয়াদের** মধ্যে তারা মধ্যপন্থী। এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সাহাবীদের প্রতি ধারণায় **রাফেজী ও খাওয়ারেজীদের** ধারণার মধ্যপন্থি। তিনি বলেন মুসলিম উম্মার মধ্যে যারা বিকৃত চিন্তাকারী, সুন্নাঃ থেকে পথভ্রষ্ঠ এবং শারীয়তের পরিবর্তনের প্রয়াসী এসব বাতেল দল থেকে আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতই সঠিক পথের অনুসারী। তারা সব ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

আল্লাহ এদের ব্যাপারে বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗا ﴾ (سورة البقرة ١٤٣)

এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতের তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।

(সুরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ১৪৩)

মুসলিমদের মধ্যে বহু ফিরকাঃ যেমন **রাফেজী, খাওয়ারেজী, আহলুত তা'তীল জাহমীইয়াঃ, কাদেরীইয়াঃ, মাতুরীদীইয়াঃ, জাবরীয়াঃ, মু'তজিলাঃ, 'আশায়েরাঃ, মুরজিইয়াঃ, হুরুরীইয়াঃ, 'ইবাদীইয়াঃ, আহলুত তামছীল (মুশাব্বাহাঃ), মুজাসসিম** ইত্যাদি - ফিরকাসমূহ আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এসব ফিরকাঃ ইসলামী সমাজের মধ্যে বিরাজমান তাই স্বাভাবিক কারণে তারা আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কামীয়াব হয়েছে। কালের আবর্তনে, একান্ত অলক্ষে, নেহাত অজান্তে বা কোন দুর্বল মুহূর্তে এসব বাতেল ফিরকাদের আকীদাঃ আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তা পাকাপাকিভাবে ঠাঁই নিয়েছেঠ। আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতের অধিকাংশ মুসলিম সে খবর রাখে না। বিখ্যাত চার ইমাম এবং আরো অনেক ইমাম, আহলে হাদীসপন্থীদের 'আকীদাঃ এক ও অভিন্ন এবং তাদের অবস্থান একই বলয়ে। আজকের দিনে মাযহাবপন্থীদেরর কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তারা যেন তাদের মাযহাবের সঠিক 'আকীদার খোঁজ করুন তাহলে দেখতে পাবেন যে চার মাযহাব আর আহলুল হাদীসদের অবস্থান শারী'য়তের একই গন্ডিতে। বর্তমান যামানার অধিকাংশ মুসলিম যেমন প্রকৃত মুসলিম নয় ইল্লা মা শা আল্লাহ আর অধিকাংশ মাযহাবপন্থীরাও প্রকৃত মাযহাবের অনুসারী নয়। তা যদি হতো তাহলে নিজেদের মধ্যে এত দ্বন্দ, কোন্দল আর বিরোধ দেখা দিতো না। অজ্ঞতা, গোড়মী, সংকীর্ণতা, অহংকার ও ঈর্ষা ইত্যাদি খাসলতের কারণে একই বলয়ের মধ্যে অবস্থান করেও একে অপর থেকে বহুদুরে। কেউ কাউকে জানার বা বুঝার চেষ্টাও করে না। মানব মনের চিরন্তন বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ﴾ (سورة المؤمنون ٥٣)

প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়েই তারা আনন্দিত।

(সুরাঃ আল-মু'মিনুন, আয়াঃ ৫৩)

পরিশেষে আল্লাহর অঙ্গা-প্রতঙ্গা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার 'আকীদাঃ এবং হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম তাহায়ীর 'আকীদাঃ বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য যা আহলে সুন্নাঃ ওয়াল জামা'য়াতেরই 'আকীদাঃ। 'আকীদাঃ অর্থাঃ মৌল বিষয়ে ইমামদের মধ্যে এমনকি সালাফীদেরও কোন মতভেদ নেই কিন্তু ফিকহার গৌণ মাসয়ালা বা শাখা-প্রশাখা নিয়ে মতভেদ লক্ষ্যণীয়। আসাস বা মূল একই। এ ব্যাপারটা মাযহাবপন্থীদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ পাক-ভারত উপমহাদেশে মাযহাব নিয়ে যারা এত বাড়াবাড়ি করে থাকেন তারা কি সঠিক 'আকীদার কোন খোঁজ খবর রাখেন? সঠিকভাবে ইমাম আবূ হানীফার 'আকীদার অনুসরণ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়। অন্যদিকে লা-মাযহাবীদের কিছু 'আলেম ছাড়া সাধারণ লোক এ বিষয়ে অজ্ঞ। আসল বিষয়ের খোঁজ নেই গৌণ বিষয় নিয়েই বাড়াবাড়ি আর কাজিয়া। আর এ করতে গিয়েই মূল/আসল বিষয় 'আকীদার প্রচার ও প্রসার হয় নি এমনকি তেমন কোন আলোচনাও হয় না। তাআ দীনের বুনিয়াদ এতই নড়বড়ে ও দুর্বল।

'আকীদার মৌল বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের 'আলেম সমাজ নীরব থেকেছেন। ফিকহী মায়ালা নিয়েই সরব রয়েছেন। তাদের লেখনি, বক্তৃতা ও আলোচনায় কখনও 'আকীদার বিষয় ঠাঁই পায় নি। মাদ্রাসাঃ, মক্তবেও এ বিষয়ে দারস দেয়া হয় না এবং এ বিষয়ে কোন গুরুত্বও আরোপ করা হয় না অথচ ইসলামের আসাস/ভিত্তি হলো 'আকীদাঃ। 'আকীদাঃ দুরস্ত বা সঠিক হলেই তবে তা জীবনে বাস্তবায়ন হবে 'আমলের মাধ্যমে এর বর্হিঃপ্রকাশ হবে আখলাক/মু'য়ামেলাত বা আচার-আচরণে সৌরভে।

আল্লাহ আকাশের উপরে না সর্বত্র বিরাজমান?

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আমাদের জন্য ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। আমরা যার আদেশ পালন করি, যার কাছে দু'য়া করি, যার সাহায্য প্রার্থনা করি, সব সময় যাকে স্মরণ করি এবং শরণ কামনা করি সেই পরম সত্তার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার নয় কি? নইলে কি ধারণা নিয়ে আমরা তাঁর 'ইবাদত করব? তাঁর অবস্থানের প্রতি আমাদের কি বিশ্বাস রাখতে হবে? কুরআন ও হাদীসের দালীল, সম্যক জ্ঞান এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আল্লাহর সঠিক অবস্থান এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

١. ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ (سورة طه)

পরম করুণাময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। (সূরাঃ তাহা, আয়াঃ ৫)

আল্লাহর 'আরশ আকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত এবং তিনি তারই উপর সমাসীন রয়েছেন তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন।

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٢. ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ﴾ (سورة النحل – ٥٠)

তাদের প্রতিপালককে তারা ভয় করে যিনি তাদের **উর্ধ্বে' অবস্থান করেন**।

(সূরাঃ আন-নাহাল, আয়াঃ ৫০)

তিনি উর্ধ্ব জগতে আছেন; সবত্র নয়।

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٣. ﴿ وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ۝١٨ ﴾ (سورة الأنعام)

তিনি নিজ বান্দা/দাসদের উপরে পরাক্রমশালী এবং তিনি প্রাজ্ঞময়, জ্ঞাতা।

(সূরাঃ আল-আন'য়াম, আয়াঃ ১৮)

উপর থেকেই তিনি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণকারী; নিচে থেকে নয়।

৪. আল্লাহ তা'য়ালা 'ঈসা ('আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন ঃ

٤. ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ ﴾ (سورة النساء– ١٥٨)

বরং আল্লাহ তাকে ('ঈসা) তাঁরই নিকট (উর্ধ্বে) উঠিয়ে নিয়েছেন।

(সূরাঃ আন-নিসা, আয়াঃ ১৫৮)

আল্লাহ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৫. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

٥. ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ﴾ (سورة فاطر ١٠)

সৎবাক্য তাঁরই দিকে আরোহন করে এবং পুণ্যকর্ম তাঁরই দিকে উত্থিত হয়...।

(সূরাঃ ফাতের, আয়াঃ ১০)

সব 'আমলই আল্লাহর কছে উপরে পোঁছে যায়।

৬. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

٦. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (سورة الأعراف – ٤٠)

অবশ্য যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তার প্রতি অহংকার করে তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াঃ ৪০)

মিথ্যাবাদী ও অহংকারীদের 'আমলনামা আকাশে আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না।

৭. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٧. ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (سورة المعارج – ٤) ..

মালায়িকা (ফিরিশতাগণ) এবং রুহ (আত্মা) তাঁরই দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়...।

(সূরাঃ আল-মা'য়ারেজ, আয়াঃ ৪)

উর্ধ্বকাশে আল্লাহর কাছেই তারা ফিরে যায়।

৮. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

٨. ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ ...﴾ (سورة النحل ٢)

মালায়িকা (ফিরিশতাগণ) তাঁরই আদেশক্রমে ওহী (প্রত্যাদেশ) সহ অবতীর্ণ হয়...। (সূরাঃ আল-নাহল, আয়াঃ ২)

আল্লাহর আদেশে উর্ধ্বাকাশ থেকে তারা নিচের পৃথিবীতে নেমে আসে।

৯. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

٩. ﴿ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ ... ﴾ (سورةالأنعام – ٩٢)

এবং কল্যাণময় এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। (সূরাঃ আল-আন'য়াম, আয়াঃ ৩)

উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত আল্লাহর কাছে থেকেই কুরআন নাযীল/অবতীর্ণ হয়েছে।

১০. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

١٠. ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ... ﴾ (سورةالأنعام – ٣)

এবং তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে আছেন। (সূরাঃ আল-আন'য়াম, আয়াঃ ৩)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবন্ কাসীর বলেন ঃ সমস্ত তাফসীরকারীগণ একমত যে জাহেল বা পথভ্রষ্ট ফিরকাদেরমত আমরা বলতে পারি না যে আল্লাহ সবখানে আছেন বা সর্বত্র বিরাজমান - কেননা আল্লাহর যাত বা সত্তা আকাশের উর্ধ্বে 'আরশের উপর সমাসীন কিন্তু পৃথিবীতে বা সমগ্র বিশ্বে তিনি তাঁর জ্ঞান/'ইলম দ্বারা সব কিছু পরিজ্ঞাত এবং নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র সৃষ্টবস্তুর তদারকীর জন্য সেই অসীম সত্তার সশরীরে মর্তে বা ধরার ধুলিতে অবতরণের প্রয়োজন হয় না। সব কিছু তিনি উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

যদি বলা হয় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহলে তা হিন্দুধর্মের অনুসরণ করা হবে। হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় ডঃ দুর্গাদাস বসু স্বরস্বতী বলেন ঃ "হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ হইল ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিরাজমান... তিনি শুধু বিশ্বচরাচরকে আবৃত করিয় রাখিয়াছেন তাহ নহে, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বা অনুমেয় তাহার সবই তিনি। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নাই; বিশ্বজগৎ তাঁহারই অভিব্যক্তি। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ... অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রহ্ম।"

"হিন্দুধর্মের অনুসিদ্ধান্ত হইতেছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদত্ব বা একাত্মতা। যখন সেই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন প্রতিটি জীবের আত্মা পরমাত্মা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন।"

সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির সাথেই মিশে আছেন, তাই যে কোন সৃষ্টবস্তুর পূজা বা উপাসনা স্রষ্টারই উপাসনা। এ জন্যই হিন্দুরা গাছপালা, পাথর বা জন্তু-জানোয়ারেরও পূজা করে কারণ এ সবের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান বা বিরাজমান। তাই হিন্দুরা বিশ্বাস করে ঃ ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। **(সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)১** কিন্তু তাওহীদবাদী মুসলিমগণ বিশ্বাস করে ঃ **অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্ঠের সাথে রয়েছেন তাঁর 'ইলম/জ্ঞানের দ্বারাই।** তাই মূসা ও হারুণকে ('আলাইহিমা আস-সালাম) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ **তোমরা (দুজন) ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি এবং তোমাদেরকে দেখছি ও শুনছি।"** (সূরাঃ তাাহা, আয়াঃ ৪৬)

এই বয়েছি বা অবস্থান তাঁর শারিরীক অবস্থান নয় বরং তাঁর বিশেষ ক্ষমতার ইঙ্গিত। আল্লাহ তা'য়ালা বার বার বলেন যে তিনি আকাশে আছেন বা বহু উর্ধ্বে অবস্থান করছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤ ﴾ (سورة الحديد)

তোমরা যেথায় থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন; এবং তোমরা যা কিছুই করে থাক সে সবেরই আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী। (সূরাঃ আল-হাদীদ, আয়াঃ ৪)

অর্থাৎ তিনি আমাদের সদা-নিরীক্ষণকারী, আমাদের সব কাজেরই প্রত্যক্ষদর্শী এবং শ্রবণকারী কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণশক্তির স্বরূপ তাঁরই অসীম ক্ষমতা ও পরম সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর সাদৃশ্য বা উপমা কোন সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। (কুরআন)

১১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জীবনে এক মাশহুর ঘটনা।

١١. ((وعرج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَتَّى كَلَّمَهُ رَبُّهُ ، وفرض عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ)) (رواه البخاري و مسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সপ্তাকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল এমনকি তাঁর সাথে তাঁর প্রতিপালক কথা বলেন। এবং তাঁর উপর পাঁচ সালাত/নামাজ ফারদ করেন। ২

আল্লাহ তা'য়ালা সর্বত্র বিরাজমান হলে পৃথিবীর যে কোন স্থানেই তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সাথে কথা বলতে পারতেন; সপ্তাকাশের উপর তাকে উঠিয়ে নিয়ে ইসরা ও মিরাজের প্রয়োজন হতো না।

---

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ (যজু) ৩।১৪।১; ৬।৮।৪,৭।

২. আল-বুখারী নং ১৪৫৮; মুসলিম নং ১৯; আন-নাসায়ী নং ৪৪৯; আহমদ নং ২৭৭৯৭। আদ-দারেমী নং ১৬১৪।

১২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

١٢. () أَلاَّ تَأْمَنُونِيْ ، وَأَنَا أَمِيْنٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) (رواه البخاري ومسلم)

তোমরা কী আমার উপর আস্থা রাখ না, যিনি আকাশে আছেন আমি তো তাঁর কাছে আস্থাভাজক।১

১৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

١٣. ((إِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْض يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) (الترميذي)

যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া করো (তাহলে) আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। ২

১৪. মাশহুর হাদীছে উল্লেখিত ঃ

١٤. ((سَأَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللهِ؟ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ ، قَالَ مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة))

(مسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলল ঃ আকাশে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কে? সে জবাব দিল ঃ আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে মু‘মিনাঃ/বিশ্বাসিনী। ৩

১৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

١٥. ((وَالعَرْشُ فَوقَ المَاءِ ، وَاللهُ فَوقَ عَرْشِهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه

(أبو داود و إبن حبان)

‘আরশ পানির উপর, আর আল্লাহ ‘আরশের উপর এবং তোমরা যে অবস্থায় আছো তা তিনি সম্যক অবহিত।৪

সপ্তাকাশের উপর মহা ‘আরশের উপর থেকেই তিনি আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আমাদের সকল বিষয়ই তাঁর নখদর্পণে।

---

১. আল-বুখারী নং ৪৩৫১; মুসলিম নং ১০৬২।

২. আত-তিরমিযী নং ১৯২৪; আবূ দাউদ নং ৪৯৪১।

৩. মুসলিম নং ৫৩৮; আন-নাসায়ী নং ১২১৮; আবূ দাউদ নং ৯৩০ ও অনেকে।

৪. আবূ দাউদ নং ৯৩০; আত-তিরমিযী নং ২২৪৭।

১৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র স্ত্রী যায়নাব বিনীত গর্বে অন্য সপত্নিদেরকে বলতেন ঃ

١٦. ... تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ .
(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

... তোমাদের আহল/পিতা বা আত্মীয়গণ তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহ আমার বিয়ে দিয়েছেন সপ্তাকাশের উর্ধ্বে ।১

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র পালক পুত্র যায়েদের স্ত্রী যায়নাব তালাকপ্রাপ্তা হলে আল্লাহর আদেশেই তিনি তাকে শাদী করেন।

١٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)) (متفق عليه)

১৭. আবূ হুরাইরা (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমাদের মহান প্রতিপালক প্রত্যে রাতে শেষ তৃতীয় প্রহরে পৃথিবীর আকাশে **অবতরণ করেন** এবং বলেন ঃ কে আমার কাছে দু'য়া করে আমি তার জবাব দেব; কে আমার কছে চায় আমি তাকে দেব; কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ২

সাত আকাশের উর্ধ্বে মহান 'আরশ থেকে আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনার জন্য যদি তিনি আমাদের সাথেই থাকতেন তাহলে এ হাদীসের অর্থ কি হবে? এ হাদীসটি সাহীহ এবং মাশহুর।

হাদীসে কুদসীতে ইবনু আবীদ দুনইয়া জাবের (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন; যখন 'আরাফার দিন আসে তখন মহান ও মর্যাদাশীল প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটতম আকাশে **অবতীর্ণ হন** এবং হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন ঃ আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা এলোমেলো কেশে ধুলিধুসরিত বেশে বহু দূর-দুরান্ত তেকে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকতে ডাকতে এখানে এসেছে। আমি তোমারেদকে সাক্ষী রাখছি যে ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ আরয করেন ঃ হে মহাপ্রতাবশালী তাদের মধ্যে অমুক ও অমুক বড় গুনাহগার। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'আরাফার দিন ব্যতীত এমন অন্য কোন দিন নেই যেদিন অধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ৩

---

১. মুসলিম নং ২৭১৩, আত-তিরমিযী নং
২. আল-বুখারী ও মুসলিম এবং আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।
৩. হাদীসে কুদসী আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী; একই সূত্রে হাদীসটি বাগবীর শরহে সুন্নাঃ থেকে মিশকাতে বর্ণিত আছে।

১৮. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন ঃ

١٨. ((أن الله يَنزلُ إلى السماءِ الدنيا)) ، ((إن الله يُرى في القيامة)) وما أشبه هذه الأحاديث : نؤمن بها ، ونصدق بها ، لا كيف ، ولا معنى ، ولا نردّ شيئا منها ، ونعلم أن ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه و سلم) حقٌّ ، ولا نرد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا نَصِفُ الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا غاية ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ ونقول كما قال ، ونؤمن بالقرآن كله ، محكمة ومتشابهة ، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ، ولا نتعدَّى القرآن والحديث ، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وتثبيت القرآن)) العقيدة الصافية ، ص- ٣٣٥

((আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন)), ((কিয়ামতের দিনে আল্লাহকে দেখা যাবে)) এ ধরনের যত হাদীস আছে- তাতে আমরা ইমান আনি, তা বিশ্বাস করি, তাঁর কোন কাইফ (ধরন বা স্বরূপ) নেই, তাঁর অন্য কোন অর্থ নেই। এ সবের কোন কিছু প্রত্যাখান করি না। আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা হক বা সত্য। এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কোন কিছুকে আমরা প্রত্যাখান করি না। আল্লাহ নিজকে বা তাঁর সত্তাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার অধিক আমরা অনর্থক বর্ণনা করি না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাঃ আশ-শুরা, আয়াঃ ১১)

তিনি যেমন বলেছেন আমরাও তেমন বলি। আমরা সম্পূর্ণ কুরআনের উপর ঈমান আনি- সুস্পষ্ঠ এবং অস্পষ্ঠ আয়াতসমূহে আমাদের ঈমান সদৃঢ়। কুরআনের সিফাতের কোন এক সিফাতকেও অস্বীকার করবো না। কুরআন ও হাদীসের সীমা অতিক্রম করব না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সত্যায়ন এবংয় কুরআনের প্রামাণিকতা ছাড়া কুরআনের হাকীকতের কাইফ (স্বরূপ বা ধরন) জানি না। (আল-'আকীদাঃ আস-সাফীয়াঃ, পৃষ্ঠা নং ৩৩৫)

١٩. وَسُئِلَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَك رحِمهُ اللهُ : كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ.

১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহু) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ কি ভাবে আমাদের রব/প্রতিপালককে জানতে পারব? তিনি বলেন ঃ **আকাশের উর্ধ্বে 'আরশের** উপর তিনি সমাসীন, তার সৃষ্ট বস্তু থেকে বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শুধু পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে আবার তাঁর মহাসনে বা 'আরশে আরোহন করেন। দুনিয়াতে নেমে আসেন না বা পৃথিবীর আকাশেও বরাবর অবস্থান করেন না বরং তাঁর মহান 'আরশেই তাঁর অবস্থান। যারা দাবী করে ঃ মু'মিনের হৃদয়েই আল্লাহর 'আরশ। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। এবং হিন্দুদের কথার অনুসরণ ভক্তের হৃদয় ভগবানের আসন।

২০. ইমাম মালেক বলেন ঃ

٢٠. (الاستواء غير مجهول ، وكيف غير معقول ، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة) انظر : العقيدة الصافية صـ ٣٥٣ نقلا عن (لمعة الاعتقاد لهادي إلى سبيل الرشاد) ابن قدامة المقدسي .

আল-ইসতিওয়া الإستواء / উর্ধ্বে আরোহন (আমাদের কাছে) অজানা নয়, তবে তাঁর কাইফ অর্থাৎ ধরন বা স্বরূপ জ্ঞানের অতীত; এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ্'য়াঃ। (আল-'আকীদাঃ আস-সাফীয়াঃ, পৃষ্ঠা নং ৩৩৫)

কুরআন ও হাদীস যেভাবে আল্লাহর অবস্থান, আরোহন ও অবতরণ বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুটো পৃথক সত্তা এবং দুয়ের অবস্থানও বহুদুরে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সাথে বিরাজমান নন কিন্তু **তাঁর 'ইলম/জ্ঞান সর্বত্রই...**।

এছাড়া কিছু সাধারণ বুদ্ধিসম্মত দলীল পেশ করা যায়। আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় মানুষ উপরের দিকে হাত উঠায় এবং দৃষ্টি উঠায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি উপরের দিকে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দু'য়া করেছেন। ওযু করার পর দু'য়া করার সময় তিনি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং উপরের দিকে তর্জনীর ইশারাও করেছেন। বিদায়ী হাজ্জে যখন সকলে সাক্ষী দিলেন যে ঃ আপনি আমানত পোঁছে দিয়েছেন, কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং উম্মতকে সঠিকভাবে নসিহত করেছেন...। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো।১

উপরে আলোচিত 'আকল যুক্তি ও নাকল কুরআন-হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে **আল্লাহ আকাশের বহু উর্ধ্বে, 'আরশের উপরেই সমাসীন;** সর্বত্র বিরাজমান নন।

---

১. আল-বুখারী ৩/৫৭৩,১৭৩৯।

আল্লাহর মহান সত্তাকে পৃথিবীর মাটিতে টেনে আনার বিশ্বাস অদ্বৈতবাদী, অবতারবাদী ও জন্মান্তরবাদীদেরই বিশ্বাস।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন
বিষ্ঠভ্যহমিদং কৃৎস্নককোংমেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।

অনুবাদঃ হে অর্জ্জুন! অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি তাৎপর্যঃ পরমেশ্বর ভগবান সর্বভূতে পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ঠ হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান।১

এ ধরনের বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত হয়েছে অনেক কাহিনী : নররূপে নারায়াণ স্বর্গ থেকে মর্তে এসে অধর্ম বিনাশ করেন এবং ধর্ম স্থাপন করেন। নররূপে নারায়ণ "ধরণীর মধুময় ধূলিতে" জীবের সাথে লীলা করেন যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে লীলা, রাধিকার সাথে প্রেম ইত্যাদি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৌন ধর্মেও সেই একই সূর। ভগবান বুদ্ধ কখনো মানুষরূপে কখনো পশু পক্ষী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন – জাতকের কাহিনীতে রয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ। হিন্দুধর্মে দেখা যায় : স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের সারথী হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ২

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় সে বদরের যুদ্ধে সহস্রাধীক কুরাইশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহবী নিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছেন। স্বল্প সংখক মু'মিনদের জয়যুক্ত করার জন্য আল্লাহ ফিরিশতা প্রেরণ করেছিলেন। সূরাঃ আলে 'ইমরানের ১২৩-১২৭ আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে 'না'উযু বিল্লাহ' আল্লাহ স্বয়ং যুদ্ধ করতে আসেন নি এবং কারুর সাথীও হন নি। কেননা তাঁর অসীম সত্তারসাথে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মুসলিমদের বিশ্বাস আল্লাহ এ দুনিয়ায় সশরীরে অবতরণ করেন না, জন্মগ্রহণ করেন না ও তিনি কাউকে জন্ম দানও করেন না। সূরাঃ ইখলাসের মধ্যে তিনি যা বলেন তা হিন্দুদের অবতারবাদ ও পাসীদের দ্বিত্ববাদ ও খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) র বিপরীত।

---

১. শ্রীমদ্ভগবত গীতা যথাযথ-পৃষ্ঠা ৫২৫; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কতৃক সম্পাদিত, অনুবাদ ঃ শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট, মায়াপুর।

২. ঐ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤ ﴾

বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি; এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরাঃ ইখলাস)

গীতায় বলা হয়েছে:

গর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজদাত পিতা।। (ভঃ গীঃ ১৪।৪)

অনুবাদ : হে কৌন্তয়! সমস্থ যেনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাদের প্রসূতি এবং আমিই তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

ব্যখ্যা ঃ বিভিন্ন কর্ম অনুসাসে জীব বিভিন্ন রকমের দেহ প্রাপ্ত হলেও এখানে ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলের পিতা। তাই এই পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করেন তার পতিতবন্ধ সন্তানদের উদ্ধার করার জন্য, যাতে তাদের শ্বাশত সনাতন অবস্থা ফিরে পেয়ে ভগবানের সঙ্গে চিরন্তন সঙ্গ লাভ করে এবং সনাতন শ্বাশত চিদাকাশে আবার অধিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যুগে যুগে তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে অবতরণ করেন...।১

হিন্দুদের বিশ্বাস ঃ **সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম** অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান; **সর্বব্যাপী সর্ববূতান্তারত্মা**- ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। জীবাত্মা আর পরমাত্মা অভিন্ন। যত্র জীব তত্র শিব। তাই শংকরাচার্য ঘোষণা করেন ঃ **অহম শিবহোম** - আমি্ই সেই শিব। অন্যত্র আছে **অহং ব্রহ্মাস্মী** - আমি্ই সেই ব্রহ্ম। (পূর্বোল্লোখিত)

---

১. শ্রীমদ্ভগবত গীতা যথাযথ-পৃষ্ঠা ১৮; কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন্দু ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কতৃক সম্পাদিত, অনুবাদ ঃ শ্রীমদ ভক্তিচারু। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট, মায়াপুর।

মানষ সত্যময় ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় মানুষও সত্য। তাই কবি চন্ডিদাস বলেন ঃ

শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।

যত্র জীব তত্র শিব। তাই শিব জ্ঞানে জীব পূজা করা ঈশ্বরকেই পূজা। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ

বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি তোমার কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বকে কবি রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদের ভাবধারায় প্রকাশ করলেন।

সীমার মাঝে অসী তুমি বাজাও আপন সূর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। গীতাঞ্জলী ১২০

চারিদিকে তার মানব মহিমা উটিছে গগণ পানে
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা অসীমের মাঝাখানে।
কড়ি ও কোমল ঃ আহবানগীতি

সকলের মাঝে সবখানে যে ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন সেই খানেই কবির তুমি আবিস্কারই স্বর্গলাভ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধুলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি। গীতাঞ্জলী

বিশ্বের সাথে যে ঈশ্বর মিশে আছেন সেইখানে কবিরও যোগ।

বিশ্ব সাথে যোগ যেথা বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো। গীতাঞ্জলী ৯৮

কবি মনে করেন তার এই ধরাধামে আসাল মুল কারণই সীমার মাঝে অসীমের লীলা।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে। গীতাঞ্জলী ১৩০

বৈদিক কবি রবীন্দ্রনাথ সকলের মধ্যে যে অপরূপকে দেখে গেলেন তা জীবন সায়াহ্নে সকলকে জানিয়েও গেলেন।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যারে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই-
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই। গীতাঞ্জলী ১৪২

গীমার মাঝে অসীমের লুকোচুরি, সন্তের মাঝে অনন্তের সন্ধান এবং তাঁর সাথে মিলনেই কবি রবিন্দ্রনাথ জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এ ভাবধারা সুফী, বৈষ্ণব ও বাউলের সাথে অভিন্ন যা বৈদিক দর্শন থেকেই গৃহীত। তিনি বলেন ঃ "অজ্ঞাতসারে আমি আমার বৈদিক উত্তরসূরিদের পথই অনুসরণ করিয়াছি।"

ভারতীয় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বই হিন্দুধর্মে সারতত্ত্ব বইয়ের বিখ্যাত লেখক ডঃ দুর্গাদাস সরস্বতী মহাশয় বলেন :

"বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপিত্বের ভিত্তির উপরেই হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকিতার শ্রেষ্ঠ সোপান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"১

ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপিত্বের ধারণা বৈদিক ভাববাদী ধারণা থেকেই উদ্ভত। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন... ঈশ্বর, জীব ও জগত পরমব্রহ্মের তিনটি বিভিন্ন রূপ...।২

ইসলামে আল্লাহর সর্বব্যাপিত্বের থারণ বৈদিক অদ্বৈতবাদী ধারণার বিপরীত। খালেক/স্রষ্টা আর মাখলূক/সৃষ্ট দুটো পৃথক ও ভিন্ন সত্বা। মা'বূদ (উপাস্য) আর 'আবদ (উপাসক) দুটো দ্বৈত সত্বা; এ দুটো সত্ত্বা কখনই এক ও অভিন্ন নয়। একজনের অবস্থান সপ্তাকাশের উপরে 'আরশে; অন্যের ধরণীর ধূলায়। পার্থক্য আসমান আর জমীন। সেই অসীম সত্ত্বা, চরম শক্তিধর, পরম করুণাময় আমাদের সাথেই রয়েছেন তাঁর ইলম/জ্ঞানের দ্বারাই; তাঁর যাত/সত্ত্বায় নয়। এটাই হচ্ছে তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত। কোন সৃষ্ট বস্তুর সাথে তাঁকে একাকার করলে তাঁর আসমা ও সিফাত (সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী) কে অস্বীকার করা হয় যা তাওহীদের এক অবিচ্ছেদ্দ ও অপরিহায্য অংশ।

---

১. হিন্দুধর্মের সারতত্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫

২. পূর্বোল্লিতঃ পৃষ্ঠা- ২

যারা অদ্বৈতবাদী ধারণার অনুকরণে বিশ্বাস করে ‘আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান’ বলে, তারা তাদেরই অনুসারী যারা বিশ্বাস করেঃ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম/ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, বা ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বভূতে অধিষ্ঠিত...।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ারীউচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (أبو داؤد)

ইবনে ‘উমর বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে অন্য কাওমের (জাতির) অনুকরণ করল সে তাদেরই দলভুক্ত। ১
‘আকীদাঃ হচ্ছে ইসলামের আসাস বা ভিত্তি। আর সে ভিত্তি যদি অন্যের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আর ইসলাম থাকল কিভাবে? বড়ই দুঃখের কথা যে ভারতীয় উপমহাদেশে ‘আকীদাঃ নিয়ে কারও কোন আলোচনা নেই। শুধু ‘ইবাদত আর ফজিলত নিয়েই সকলে ব্যস্ত।

---

১. পূর্বোল্লিখিত : পৃষ্ঠা ১২

Reference

১. **العقيدة الطحاوية** – لإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز . ناشر : مكتبة السنة – القاهرة

২. الشرح الميسر **للفقه الأكبر** المنسوب لأبي حنيفة – بقلم د. محمد بن عبد الرحمن الخبيس . ناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة و الإرشاد ، ١٤٢٠ – المملكة العربية السعودية .

৩. شرح **كتاب التوحيد** من صحيح البخاري – تأليف عبد الله بن محمد الغينمان . ناشر : دار العاصمة للنشر و التوزيع – ١٤٢٢، المدينة المنورة ؛ المملكة العربية السعودية .

৪. شرح **العقيدة الواسطية** : شيخ الإسلام أين تيمية : تعليق – د. محمد خليل الحراس

ناشر – دار الهجرة للنشر و التوزيع– ١٤٢٢، الرياض ، المملكة العربية السعودية

৫ . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل تأليف : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، دراسة وتحقيق.د:/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان ، الطبعة السادسة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م مكتبة الرشد الرياض.

৬. عقيدة المؤمن : تأليف أبو بكر جابر الجزائري ، دار الكتب السلفية القاهرة .

৭. العقيدة الصافية للفرقة الناجية . تأليف سيد سعيد عبد الغني ، الطبعة الرابعة ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م دار طيبة الخضراء .

৮. عقيدة أهل السنة الجماعة على ضوء الكتاب والسنة تأليف د /: سعيد بن مسفر القحطاني ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه ٢٠٠١ م دار طيبة الخضراء.

৯. العقيدة في الله تأليف د: عمر سليمان الأشقر الطبعة الثانية عشر ١٤٢١هـ ٢٠٠م دار النفائس أردن .

১০. عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن تأليف حمود بن عبد الله بن حمود التويجري ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م دار اللواء للنشر والتوزيع .

১১. اسم الله الأعظم جمع ودراسة وتحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة في ذلك تأليف د / عبد الله بن عمر الدميجي دار الوطن الرياض . الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م .

11. The Right way : A summarized Translation by Shaikhul Islam Ibn Taimiyah, Published by Darus Salam., Riyadh, 1996.
12. Sharh Al-Aqidaht-il-Wasitiyah, commented by Dr. Khalil Harras, Tanslated by Rafiq Khan, Pulished by Darrus Salam, 1996, Riyadh.
13. The Names and Attribute of ALLAH according to the doctrine of Ahlus Sunnah Wal Jamah. By Shaikh Umar Sulaiman Al-Ashqar, 1999, Published by Jamiat Ihyaa Minhaaj Al-Sunnah, UK.

রাসূলুল্লাহ না হুজূর পাক/ আঁ হযরত?

ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ রাসূল ও নাবীর নাম মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাঁর কুনইয়াঃ – আবুল কাসেম, নাসব– কুরাইশী/হাশেমী, নিসবাঃ – মাক্কী/মাদানী এবং লকব (উপাধি) – রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ লকবেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তামাম হাদীস বর্ণনাকারীগণ কালা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল বলেছেন বা **কালান নাবীউ** (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে শুরু করেছেন। আবূ হুরাইরা (রাদী আল্লাহু 'আনহু) বিশেষ এক হাদীসে কালা আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র গুণগত নামগুলো বিশেষ প্রয়োজনের গুরুত্বে ব্যবহৃত হয় যেমন ঃ নাবীউল মুস্তফা, রাসূলুল মুজতাবা, নাবীউর রাহ্মাঃ ইত্যাদি।

এসব হাদীসে ব্যবহৃত প্রয়োগরীতি ত্যাগ করে হুজূরপাক যোগে বলা হয় হুজূরপাক ফরমাইয়াছেন – ইত্যাদি। এভাবে বলা হলে হাদীসের খেলাপ হয় না কি? রাসূলুল্লাহ বা নাবী (মুহাম্মদ) শব্দের উচ্চারনের সাথে সাথেই মু'মিন বক্তা বা শ্রোতাকে তাঁর উপর সালাত বা সালাম পাঠ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

কৃপণ/বাখীল সে যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ করা হলে সে আমার উপর সালাত পাঠ করে না।১

মুহাম্মদ বিন 'আবদুল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ বা নাবী শব্দের দ্বারা শেষ নাবীকে বুঝালেই তার জন্য সালাত ও সালাম পড়তে হয় কিন্তু হুজূরপাক বললে সেটা হয় না অর্থাৎ দরূদ বা সালাত ও সালাম পড়া হয় না এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তথাকথিত 'আশেকে রাসূলদের এ কথা জানা দরকার।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জীবদ্দশায় এবং তার ইন্তেকালের পর 'আব্বাসী যুগের প্রথম পর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাকবেই তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। 'আব্বাসী যুগের শী'য়া প্রভাবিত পরিবেশে এবং পরবর্তীকালে সূফী প্ররোচনায় ভারতবর্ষের শির্কী জমিনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামে অতিরঞ্জের ব্যাপক হিড়িক পড়ে যায়। তাই তাঁকে সরওয়াওে কায়েনাত, আঁ হযরত, নবীয়ে জান, মালিকে দোজাহান, ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়।

---

১. আত-তিরমিযী নং ৩৫৪৬; আহ্মদ নং ১৭৩৮।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :
“আমাকে অতিরঞ্জিত করো না যেমন নাসারাগণ (খ্রিষ্ঠান) মারইয়াম তনয় ‘ঈসা (‘আলাইহিস সালাম)‘র প্রতি (আল্লাহর পুত্র বলে) করেছে। নিশ্চয়ই আমি ‘আবদ/দাস, তোমরা বলো আল্লাহরই দাস এবং তাঁরই রাসূল/দূত।”১

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :
“... তোমাদের অনুসরণের জন্য রইল আমার সুন্নাঃ ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীদের সুন্নাঃ; তোমরা দৃঢ়ভাবে তা ধরে থাকবে...। ”২

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :
“আমার যুগের মানুষই হলো সর্বোত্তম, তারপরে যারা আসবে (তারা উত্তম), তারপর যারা আসবে (তারা ভাল), তারপর যারা আসবে...। ”৩

সাইয়্যেদুন নাাস (মানব জাতির সর্দার) খায়রুল বাশার (সর্বশ্রেষ্ঠ মানব) মুহাম্মদ ইবনে ‘আব্দুল্লাহ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : “নিশ্চয়ই বিশ্বাস ভক্তি ও প্রজ্ঞায় আবূ বাকারকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।”

---

১. আল-বুখারী নং ৩৪৩৫; আহমদ নং ১৫৫; আদ-দ্যারেমী নং ২৭৪৮।
২. আবূ দাউদ নং ৩৯৯১; ইবনে ম্যাজাঃ নং ৪২; আহমদ নং ১৬৬৪৯।
৩. আল-বুখারী নং ২৬৫২; মুসলিম নং ২৫৩৩; আত-তিরমিযী নং ২২১; আহমদ নং ৩৫৮৩।

'উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রাদী আল্লাহু 'আনহু) সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "আমার প্র কোন নাবী তা হতো 'উমর ইব্ন আল-খাত্তাব...।" 'উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রাদী আল্লাহু 'আনহু), 'আলী ইব্ন আবী তালেব (রাদী আল্লাহু 'আনহু) বাকী 'আশারাতুল মুবাশ্শারাঃ ও অন্যান্য সুবিখ্যাত সাহাবীদের উৎকর্ষতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র অনেক কাওল আছে, সেগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে পৃষ্ঠা বাড়াতে চাইনে। অতি সংক্ষেপে ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র চার খালীফা ও সাহাবীগণ নাবীউল মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূলুল্লাহ বা নাবী লকবে বর্ণনা করেছেন। কোন লাফজের দ্বারা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গুল/অতিরঞ্জিত করেন নি তাঁর মর্যাদার নাকেস/ঘাটতিও করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসায় আবূ বাকার আস-সিদ্দীক (রাদী আল্লাহ 'আনহু)'র মত কেউ কখনও হতে পারবে না। 'উমর ইব্ন আল-খাত্তাব, 'উসমান ইব্ন 'আফ্ফান, 'আলী ইব্ন আবী তালেব থেকে বাকী সাহাবী (রাদী আল্লাহু 'আনহু) পর্যায়ে কেউ কখনও পৌঁছুতে পারবে না। এ সকল সাহাবীগণ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূলুল্লাহ বা নাবী বলেই বর্ণনা করেছেন। অতচ ভারতীয় উপমহাদেশে হুজূর বা হুজূরপাক শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে অতিরঞ্জনের প্রায়াসে অথবা গলৎ 'আকীদার প্রয়োগে। গলৎপন্থীরা বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র মৃত্যু হলেও সবখানে হাজের থাকতে পারেন তাই তিনি হুজূর হয়েছেন- আর এ জন্যই তো কিয়াম করার সময় উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তসলিম করার এক উদ্ভট বিদ'য়াতী রেওয়াজ চালু হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানে কেউ উঠে দাঁড়ালে তিনি তা নিষেধ করতেন। তাহলে মৃত্যুর পর তাঁর রুহের কাল্পনিক আগমনে কিভাবে উঠে দাড়ান হয়? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাঃ কে তরক করে গুমরাহ তরিকার অনুসরণ এবং ভ্রান্ত 'আকীদার ইত্তেবা'/অনুসরণে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের নির্দেশিত সুন্নাঃ মুতাবেক চলার মধ্যে হিদায়েত নিহিত।

ওয়াল্লাহু হুয়াল মুয়াফ্ফেকু ওয়াল হাদী

‘আলেম/শেখ না মাওলানা/মৌলভী

মুহাম্মদ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন খাতামুন নাবীয়ীন ওয়াল মুরসালীন (সব নাবী ও রাসূলদের মোহর বা সর্বশেষ) অর্থাৎ যার পরে কোনই নাবী নেই; কিন্তু আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘র উত্তরাধিকারী, তারা হলেন ‘আলেম সম্প্রদায়। আল্লাহর মনোনীত দীনকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘র সুন্নাঃ মুতাবেক তাবলীগ করার গুরু দায়িত্ব তাদেরই বেশী। তাই তাদের ফাদীলত ও মাকাম বুলন্দ। ‘আলেম/‘ওলামার ফাদীলতের মূল্যায়নই তাদের নামে অতিরঞ্জন করে বলা হয় ঃ মৌলানা/মাওলানা বা মৌলভী/মাওলয়ী। শাব্দিক অর্থের বিচারে এবং শরী‘য়তের আলোকে আমরা বিচার করব এ শব্দদ্বয় কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সম্মত।

মাওলায়ী (مَوْلَوِيْ), মাওলানা (مَولانا), শব্দ দুটির মূল হলো মাওলা (مَوْلَى); এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইয়া (ىَ) (আমার), না (نَا) (আমাদের) – ‘আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় দামীর তামাল্লুক বা সম্বন্ধসূচক সর্বনাম।

‘আরবী অভিধান অনুযায়ী মাওলা/ مَوْلَى শব্দের অর্থ তিন ধরনের ঃ

১. প্রভু, নিয়ন্ত্রণকারী, রক্ষ, মালিক, কর্তা, অভিভাবক, তত্বাবধায়ক।
২. ভৃত্য, চাকর, মুক্ত ক্রীতদাস, তত্ত্বাবধায়নের অধীন ব্যক্তি বা বস্তু।
৩. সহচর, বন্ধু।

মাওলা/(مَوْلَى) শব্দের অর্থ সাধারণতঃ প্রভু, তত্ত্বাবধায়ক অথবা প্রভুত্ব বা তত্ত্বাবধায়নের অধীন ব্যক্তি। অর্থে দিক থেকে শব্দটি ঈড়সঃৎধফরপঃড়ৎু বা পরস্পরবিরোধী। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শব্দটির প্রয়োগরীতি অনুধাবন করলেই অর্থ স্পষ্ট হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘য়ালা বলেন ঃ

বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতিত আমাদের কিছুই হয় না। তিনি **মাওলানা/আমাদের** কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু‘মিনদের নির্ভর করা উচিত। (সুরাঃ আত-তাওবাঃ, আয়াঃ ৫১)

আল্লাহ তা‘য়ালা আমাদের প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষম করো, আমাদের প্রতি দয়া করো – তুমিই মাওলানা/ আমাদের অভিভাবক: সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ২৮৬)

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন ঃ

আল্লাহই তো তোমাদের মাওলা/তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। (সূরাঃ আল-‘ইমরান, আয়াঃ ১৫০)

মাওলাা শব্দের দ্বিতীয় প্রকার অর্থের নমুনা হলো ঃ সাওবান মাওলাা রাসূলিল্লাহ, সালেহ্ মাওলাা রাসূলিল্লাহ, কাইসান মাওলাা রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাালেম মাওলাা আবী হুযাইফাঃ (রাদী আল্লাহ 'আনহু) ইত্যাদি যার তর্জমাঃ দাড়ায় সাওবান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র চাকর বা ভৃত্য, মুক্ত ক্রীতদাস অথবা তত্বাবধানের অধীন ব্যক্তি ইত্যাদি... সাালেম আবূ হুযাইফাঃ'র ভৃত্য বা চাকর...।

মাওলা শব্দের সাথে ইয়া () যোগে 'আলেম সম্প্রদায়কে মাওলায়ী/মৌলভী এবং না () যোগে মাওলানা নামে নামকরণ করলে তাদের সম্মানের দিক থেকেও ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হয় না। আশাকরি সূক্ষ্যদর্শী নৈয়ায়িক পাঠক এর তাৎপর্য ও গুরূত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন।

স্বরণীয় যে রাজা/বাদশাহদের দরবারেই মাওলায়ী/শব্দটির সীমিত ব্যাবহার শুনা যায়। প্রায় সব বাদশাহদের দরবারেই ধর্মের বিকৃতি ঘটেছে বাদশাহদের চাটুগিরি বা প্রসন্নতালাভের আশায় তাই বাদশাহকে ইয়া মাওলায়ী বলা হতো। 'আরবী বাষার প্রয়োগরীতি মুতাবেক মালিককে তার চাকর ইয়া মাওলায়ী বলে সম্বোধন করে। মজার ব্যাপার মালিকও তার চাকরকে ডাকে ঃ ইয়া মাওলায়ী বা মাওলা/ হে আমার ভৃত্য বা সহচর।

তুকী ইরানীদের দ্বারা ভারতবর্ষের মাটিতে ঐ ধারা পোঁছেছে। ভাষায় অজ্ঞতার কারণে অথবা 'আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি অতিভক্তিতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে মাওলায়ী/মাওলানা উপাধি। 'আরব মূলকে কোথাও 'আলেম সম্প্রদায়কে এ উপাধিতে ডাকা হয় না।

'আলেম সম্প্রদায়কে যেভাবে মৌলভী/ মাওলানা বলা হয়ে থাকে তার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। তাদের সম্মান ও মাকামের দিক থেকে তা সামঞ্জস্যহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অবাঞ্ছণীয়।

মুসলিম না মুসলমান?

আল্লাহর মনোনীত ধর্মের নাম ইসলাম এবং এই ধর্মের অনুসারীর নাম মুসলিম। আদম ('আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল রাসূল ও নাবী নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবেই পরিচয় দিয়েছেন। নূহ ('আলাইহিস সালাম) বলেন ঃ

আমি তো মুসলিমদের মধ্যে (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী) অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি। (সূরাঃ য়ুনুস, আয়াঃ ৭২)

ইব্রাহীম ('আলাইহিস সালাম)'র জন্য কুরআনে উল্লেখিত ঃ

আর ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তার পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীন (ধর্ম)– কে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা **মুসলিম** না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না। (সূরাঃ আল–বাকারাঃ, আয়াঃ ১৩২)

য়ূসুফ ('আলাইহিস সালাম) বলেন ঃ

এবং তুমিই (আল্লাহ) আমার ইহকাল পরকালের অভিভাবক; তুমি আমাকে **মুসলিম** হিসাবে মৃত্যু দাও এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরাঃ য়ূসুফ, আয়াঃ ১০১)

এছাড়া কুরআন শারীফের বহু আয়াতে সব নাবীগণের পরিচয় হলো মুসলিম। 'আরবী ভাষায় ব্যাকরণ অনুযায়ী মুসলিম শব্দটি মুসলিমূন, মুসলেমীন ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করতে পারে। মুসলিম শব্দটিপ কর্তৃকারকে এক বচন (ফা'য়েল মুফরাদ); মুসলিমূন ঐ একই কারকে বহুবচন (ফা'য়েল জাম'য়া)। মুসলেমীন কর্মকারকে বহুবচন (মাফ'য়ূল জাম'য়া); অথবা সম্বন্ধপদের বহুবচন; কিন্তু ঐ সবের মূল হচ্ছে মুসলিম। মুসলিম শব্দের দ্বিবচন মুসলিমান বা মুসলিমাইন। 'আরবী বাষায় মুসলমান শব্দটির ব্যবহার কোথাও নেই। মুসলমান শব্দটি ফারসী বা তুকীকরণের দ্বারা ভারতবর্ষে পৌঁছেছে মুসলিমান বা মুসলিমাইন শব্দের বিকৃতরূপে। 'আরবী আমাদের ধমীয় ভাষা, এই ভাষাতেই আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং এ ভাষাতেই মুসলিম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরবী ভাষায় প্রয়োগরীতি অনুসরণ না করে ফারসী বা তুকীদের কায়দায় তা গ্রহণ সুবিবেচিত মনে হয় না। বিশেষতঃ শব্দটি যখন নির্ভেজাল কুরআনীয় লাফয/শব্দ।

তবে কেন আমরা কুরআনের ভাষার প্রয়োগরীতি তরক করে অন্য ভাষায়র মাধ্যমে তা গ্রহণ করব?

হুজুর/হযরত না হাদরত?

'আলেম সম্প্রদায়ের সম্মানার্থে বিশেষণের সবিশেষ লাগিয়ে বলা হয় ঃ হযরত বা হুজুর অথবা মাওলানা। এভাবেই একটা নামেই তা রূপ গ্রহণ করে যেমন ঃ হাফেযজী হুজুর, বড় হুজুর, ন'হুজুর, ছোট হুজুর/হজরত ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তামাম সাহাবী, তাাবে'য়ী, তাাবে'য় তাাবে'য়ী, আওলিয়া, 'আলেম পর্যন্ত সকলের নামের পূর্বে এক নাগাড়ে আমাদের দেশে যুক্ত হয় হুজুর বা হযরত/হজরত.....।

হাদরত/হযরত (حَضْرَتْ) শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর হলো (ض) দ্যাদ। এ হারফ বা অক্ষরটির উচ্চারণ খুবই কঠিন; এজন্য 'আরবী ভাষাকে বলা হয় লুগাতুদ্দ্যাদ। 'উমর (রাদী আল্লাহু) নাকি এর সঠিক উচ্চারণ করতে পারতেন। আহলুদ্দ্যাদ (ض) ভাষাভাষী বা 'আরবগণ এ অক্ষরকে কিভাবে উচ্চরণ এ অক্ষরকে কিভাবে উচ্চারণ করে থাকে সেটাই গ্রহণীয় যেহেতু 'আরবী তাদের মাতৃভাষা। (ض) অক্ষরের উচ্চারণ কোন মতেই জ/য'র মতো নয় আবার দ'র মতও নয়। দ'র উপর চাট দিয়ে জ/য'র অনেক দূরবর্তী ধ্বনির সমন্বয়ে এর উচ্চারণ। তাই এ অক্ষরের উচ্চারণে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু কিছু মুসলিম দেশে যেভাবে হুজুর/হযরত, ওযু/ওজু, রমযান/রমজান, ফযিলত/ফজিলত ইত্যাদি উচ্চারণ করে থাকে তা আহলুল লুগা'র (ঘধঃরাব) দের উচ্চারণ থেকে বহু দুরে। দ্ব/দ'র মতো উচ্চারণ করলে প্রকৃত শুদ্ধ না হলেও য/জ'র মতো উচ্চারণ থেকে বেশী শুদ্ধ। অধিকাংশ 'আরব দ্ব/দ'র মতো উচ্চারণ করে থাকে তবে একদল য/জ'র মতো উচ্চারণ করে; তবে সে উচ্চারণ আমাদের দ্ব/দ বা য/জ'র মতো নয়। দ্ব/দ বা য/জ'র সম্বলিত এক বিশিষ্ঠ উচ্চারণ যার উচ্চারণ 'আরবগণের পক্ষেই সহজ ও স্বাভাবিক। তাই এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। অনেক সাহাবীও কুরআনের সঠিক উচ্চারণ করতে পারতেন না কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিরুৎসাহিত করেন নি।

হাদরত/হযরত শব্দটি সম্মানসূচক অর্থে 'আরবদের মধ্যে সীমিত প্রযোগ দেখা যায় এবং তা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা বিশেষ ব্যক্তির উপস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় যেমন ঃ হাদরাতাক (حَضْرَتَكْ) বা হাদরাতিকুম (حَضْرَتِكْمْ) অর্থ ঃ আপনার বা আপনাদের সম্মানার্থে বা খাতিরে; ইংরেজীতে ণড়ঁৎ ঢ়ৎবংবহপু সন্মানের মূল্যায়নে হাদরত (حَضْرَتْ) শব্দটি তেমন খাস (বিশেষ) নয় বরং 'আম (সাধারণ) যেমন ঃ জনাব বা মিস্টার। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে হযরত মুহাম্মদ বললে তা যথার্থ হয় না বরং তার প্রাপ্য মাকাম বা মর্যাদা সম্মান থেকে 'আম (সাধারণ) পর্যায়ে টেনে আনা হয়। বিশ্ববরেণ্য, সর্বশেষ নাবীর জন্য তার সাহাবীগণ, তারও পরের তাাবে'য়ীগণ কখনও হযরত/হাদরত বা হুজুর লাফজ ব্যবহার করেন নি। এমনকি এযুগের 'আরবগণও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামের পূর্বে

হযরত/হাদরত যোগ করেন না; কেননা এ শব্দের মধ্যে এমন কোন সম্মান নেই যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামের আগে যোগ করা চলে। এভাবে খুলাফাযে রাশেদীন থেকে তামাম সাহাবা (রিদওয়ানুল্লাহি 'আলাইহিম) মাশহুর ইমাম এবং আওলীয়াদের এমনকি পীর-বুযুর্গের নামের পূর্বে এক নাগাড়ে হযরত/হজরত সংযুক্তির ব্যাপারে ফাসী (ইরানী) প্রভাব সুস্পষ্ট। এই হজুর শব্দের সংযোজনও এক ভ্রান্ত 'আকীদারই বহিঃপ্রকাশ। পীর, ওলী, বুযুর্গরা নাকি সব জায়গা হাজের (উপস্থিত) ও নাযের (তদারককারী); তাই তাদের নামের আগে এ ধরনের লাফজের সংযুক্তি। মৃত্যুর আগে বা পরে রাসূল ও আম্বিয়া ('আলাইহিমুস সালাম) গণ সব জায়গায় হাাদের-নাযের থাকেন নি - অথচ বুযুর্গের দ্বারা নাকি সম্ভব। নাউযু বিল্লাাহ মিন যালেক। আল্লাহ তা'য়ালা আমারেদরকে এ ধরনের ভ্রান্ত 'আকীদাঃ থেকে নাজাত দান করুন। আমীন!

হাদরত/হযরত শব্দের পাশাপাশি হুজূর শব্দটিকে আমরা যে অর্থের ব্যবহার করে থাকি - 'আরবী ভাষায় এর কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ মেলে না। 'আরবী ভাষায় হুদূর/হুজূর (حَضُوْرٌ) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য, যার অর্থ উপস্থিত, আবির্ভাব, হাজির, অংশগ্রহণ, আগমন ইত্যাদি। (حَضُوْرٌ) হুদূর/হুজূর হলো (حَاضِرٌ) হাাদের-এর বহুবচন অর্থ ঃ (যে ব্যক্তিগণ) উপস্থিত, হাজির, প্রস্তুত ইত্যাদি।

মিসরিয়দের মধ্যে হাাদের (حَاضِرٌ) শব্দের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কোন মিসরীকে কিছু বললেই কণ্ঠকে মধুমাখা করে বিনীতভাবে বলবে : হাাদের আইয়ে খেদমাঃ অর্থাৎ যে কোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত্ তা তার অন্তরের ইচ্ছা যাই-ই থাকুক।

হাাদের (حَاضِرٌ) শব্দটি পারস্যের পথ বেয়ে ভারতবর্ষে পোঁছেছে হুজূর হয়ে। কথায় কথায় হুজূর, জী হুজূর শোনা যায় বাংলাদেশেই বেশী। 'আলেম সম্প্রদায়ের জন্য এ লাফজটি খাস। অন্যদের জন্য স্যার, বা জী স্যার। বুদ্ধিজীবিগণ এর বিশ্লেষণে বলেন ঃ কলোনিয়াল লেগাসী বা দাসত্ব মনোবৃত্তি। আর জী হুজূর হলো অতিভক্তির আতিশয্য। হুজূর শব্দটি এমন কোনই অর্থবহ বা সম্মানজনক নয় যা বললে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝায়। হুজূর পাক ফরমায়েছেন বলে হাদীস শুরু করলে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বোঝালেও তাঁর সঠিক সম্মান দেখান হয় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন বা তাঁর নাম বা গুণগত নাম মুস্তাফা, বা আবূল কাসেম ইত্যাদির পর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে পরিচয় করানোই হচ্ছে সাহাবীদের সুন্নাঃ এবং শারী'য়তের নির্দেশ। সে সুন্নাঃ তরক করে মনগড়া উসূল বানানো হচ্ছে গুমরাহীর 'আলামত।

হারাম শরীফ না হেরেম না হরম?

বাংলাভাষী মুসলিমগণ প্রায় সকলেই হারাম কে হেরেম শরীফ বলে থাকেন। এ ব্যাপারে জাহের ও 'আলেমের কোনই তফাৎ নেই। জাহেলরা ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ করলে তার একটা ওযর দেখানো যেতে পারে কিন্তু 'আলেমগণ ভুল করলে তা কি ক্ষমার যোগ্য? হাজ্জ 'উমরাঃ ও যিয়ারাঃ সম্বন্ধে বাংলায় প্রকাশিত প্রায় সব বইতে লেখা হেরেম শরীফ অথবা হরম শরীফ। বিখ্যাত 'আলেমদের বিখ্যাত বইতেও এ ধরনের ভুল দেখায়া। সাধারণ মানুষ ঐসব 'আলেমদের অনুসরণ করে। মৌলভী বা মাওলানা নামধারী সে সব ব্যক্তিগণ নিজে তো ভুল করেই উপরন্তু অপামর জনসাধারণকেও ভুলের রাস্তায় টেনে নিয়ে আসে। আল্লাহ সকল মুসলিমকে হিদায়েত দান করুন – আমীন!

শুধুমাত্র বাংলাভাষী মুসলিমরাই হারাম/ حَرَام শব্দের যে এক প্রকার অর্থ জানে তা হলো নিষিদ্ধ, অবৈধ, বেআইনী ইত্যাদি। তাই মাক্কাঃ ও মাদীনার মাসজিদকে তারা হারাম বলতে দ্বিধাবোধ করেন। মাক্কাঃ ও মাদীনার মাসজিদের মতো মহাসম্মানিত ও অত্যন্ত পবিত্র স্থানকে হারাম বলা যে গুস্তাখী, বেয়াদবী! সম্ভবতঃ এ ধারণায় বশবর্তী হয়ে হারামকে তারা হেরেম শরীফ উচ্চারণ করে। 'আরবী ভাষায় হেরেম শব্দের অস্তিত্ব নেই; বরং আছে হারীম/ حَرِيْمْ অর্থাৎ স্ত্রী/স্ত্রীজাতি। ঐ শব্দ ফাসী বা তুর্কীকরণের দ্বারা হয়েছে হেরম অর্থ জেনানা বা স্ত্রীলোকদের আবাস, অন্দর মহল। মাক্কাঃ ও মাদীনার মাসজিদকে হেরেম বললে অর্থের দিক থেকে বিকৃত তো হয়ই উপরন্তু কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ হয়। আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআন আল-কারীমের বিভিন্ন আয়াতে অন্তত বিশ জায়গায় আল-মাসজিদুল- হারাম/ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَام এবং আল-বায়তুল-হারাম/ اَلْبَيْتُ الْحَرَام বলে উল্লেখ করেছেন। হারাম/ حَرَام শব্দের উল্লেখ আছে প্রায় ৫২ জায়গায়, বিভিন্ন আয়াতে এবং হারাম সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত আছে আরও ৩০ জায়গায়। এখন হারাম/ حَرَام শব্দের আভিধানিক অর্থ ও তার পর্যালোচনা এবং প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

হারাম/ حَرَام **শব্দের অর্থ দু ধরনের ঃ**

১) **নিষিদ্ধ, অবৈধ, বে-আইনী, অনুচিত।**

২) **পবিত্র, সম্মানিত, অলংঘনীয়।**

উদাহরণ ঃ

১) شُرْبُ الْخَمَرِ حَرَامٌ **মদপান হারাম বা নিষিদ্ধ।**

اِبْنُ اَلحَرَامِ হারাম বা অবৈধ সন্তান।

حَرَامٌ عَلَيْكَ كَذٰلِكَ এভাবে (বলা বা করা) তোমার জন্য হারাম বা অনুচিত।

২) اَلْبَيْتُ الْحَرَام হারাম বা পবিত্র ঘর (কা'বা ঘর)।

اَلْمَسْجِدُ الْحَرَام হারাম বা সম্মানিত মাসজিদ (যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত)।

اَلْبَلَدُ الْحَرَام হারাম বা অলংঘনীয় ভুমী (মাক্কাঃ, মাদীনাঃ ও জেরুজালেম)।

الشَّهْر الْحَرَام হারাম বা প্রবিত্র/সম্মানিত মাস (মুহাররাম, রাজব, যূল কা'য়াদাঃ ও যূল হাজ্জাঃ)। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্যায় ও কোন পাপ কাজ করা ভীষণভাবে নিষিদ্ধ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি ঃ

হারাম শব্দের অর্থ দু প্রকার ঃ নিষিদ্ধ এবং পবিত্র বা সম্মানিত। কুরআন মাজীদে নিষিদ্ধ অর্থে বহু জায়গায় বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন ঃ

বলো আমার প্রতিপালক হারাম/নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা...। (সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াঃ ৩৩)

তোমাদের জন্য হারাম/নিষিদ্ধ করা হয়েছে মরা, রক্ত, শূকর-মাংশ...। (সূরাঃ আল-মায়েদাঃ, আয়াঃ ৩)

পৃষ্ঠা নং ৮৬

হারাম শব্দের যে অর্থ পবিত্র/সম্মানিত সে মর্মে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে যেমন ঃ

(অতএব) আল-মাসজিদুল হারাম (**মহাসম্মানিত মাসজিদ**)**'র** দিকে তুমি মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তা দিকে মুখ ফিরাও। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ১৪৪)

আল-মাসজিদুল হারাম (পবিত্র মাসজিদ)'র নিকট তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে....। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ১৯১)

আল্লাহ তা'য়ালা কা'বাকে আল-বায়তুল হারাম (**পবিত্র ঘর**)'র মর্যাদা দান করেছেন মানুষের কল্যানের জন্য, আশ-শাহরুল হারাম (পবিত্র মাস), কুরবানীর পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকে নির্ধারিত করেছেন...। (সূরাঃ আল-ম্যায়েদাঃ, আয়াঃ ৯৭)

ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তর্জমাকৃত 'আল কুরআনুল করীম'-এ মাসজিদুল হারাম (اَلْمَسْجِدُ الْحَرَام) এর তর্জমা করেছেন ঃ মহাসম্মানিত মসজিদ১ তবে বানান আল-মাসজিদুল হারাম লিখলে বেশী শুদ্ধ হতো যেমন আল-কুরআনুল কারীম। আল-বায়তুল হারাম (اَلْبَيْتُ الْحَرَام)'র তর্জমাঃ পবিত্র গৃহ২ এবং আশ-শাহরুল হারাম (الشَّهْر الْحَرَام)'র তর্জমাঃ পবিত্র মাস।৩ তাই হারাম (حَرَامْ) শব্দের অর্থ হয় পবিত্র, সম্মানিত। মাক্কাঃ, মাদীনাঃ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকেই হারাম (সম্মানিত) বলা হয়।

---

১. পৃষ্ঠা ৩৬ ফুটনোট; ২/৩, পৃষ্ঠা ১৮১

মুসলিমদের জন্য মাত্র তিনটি হারাম বা পবিত্র স্থান। শুধুমাত্র তিন মাসজিদেই যিয়ারত করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তিনটি মাসজিদ ব্যতীত **(যিয়ারতের জন্য) তোমরা সফরের যানবাহন প্রস্তুত করো না – তা হলে আল-মাসজিদুল হারাম, আমার এই মাসজিদ এবং আল-মাজিদুল আকসা।১**

মাক্কার মতো মাদীনাকে হারাম ঘোষণা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

হে আল্লাহ! ইবরাহীম মাক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, আমি হারাম ঘোষণা করছি যা দু-পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত (অর্থাৎ মাদীনাঃ) ...। ২

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাঃ ও মাদীনাকে হারাম/পবিত্র ঘোষণা করেছেন অথচ কোন যুক্তিতে হেরেম বলা হয়? আর এরূপ বলা হলে তা সুন্নাত বিরোধী নয় কী?

আল্লাহ তো বলেন ঃ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য/অনুসরণ করো যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারো। (সূরাঃ আল-'ইমরাান, আয়াঃ ১৩২)

কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ কিংবা বিবাদ সৃষ্টি হলে তা মিমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশই গ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে মু'মিনদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের, এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী; তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ ঘটলে তা সোপর্দ কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট, এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (সূরাঃ আন-নিসাা, আয়াঃ ৫৯)

---

১. আল-বুখারী – নং ১১৮৯; মুসলিম নং ৮২৭; আন-নাসাায়ী – নং ৭০০; আবূ দাউদ – নং ২০৩৩; ইবন মাজাঃ – ১৪০৬; আহমদ – নং ৭১৫১।

২. আল-বুখারী – নং ২৮২৯. ২৮৯৩, ২২৬৭, ৪০৪৮; আত-তিরমিযী – নং ২৯২২; ইবন মাজাঃ – নং ৩১১৩; আহমদ – নং ১২১০১।

হারাম ও হেরেম মতভেদও প্রত্যেক মু'মিনদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নেয়া তাহলে কোন অবস্থাতেই আমরা হারাাম শারীফকে হেরেম শরীফ উচ্চারণ করতে পারি না।
শুধু বাংলাভাষী মুসলিমগণই হেরেম শরীফ বলে থাকে। অন্য দেশের মুসলিমদের মুখে এ ধরনের বিকৃত উচ্চারণ শুনি নি কখনও। এসব শুধু শোনা যায় এ দ্যাশেই!

"সত্যিই বড় বিচিত্র এই দেশ!"

শারীফ শব্দের তাৎপর্য

শারীফ/শরীফ শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্মানিত, শ্রদ্ধাস্পদ, সম্ভ্রান্ত-উচ্চবংশজাত বা বিখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বংশধর 'আলী (রাদী আল্লাহু 'আনহু)'র সন্তানদেরকে শারীফ বলা হযে থাকে এবঙ 'উসমানী 'আমলে মাক্কার গভর্ণরকেও শারীফ বলা হতো।

সাধারণতঃ শারীফ বলতে সম্মানিত বা শ্রদ্ধাস্পদই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই হাদীসের শেষেও শারীফ শব্দের সংযোজন হয়েছে। আল্লাহ তাঁর শেষ কিতাব আল-কুরআনকে কারীম ও মাজীদ বলেছেন, কিন্তু শারীফ বলেন নি যা সাধারণ মুসলিমগণ বলে থাকেন। দেখা যায় যে শারীফ শব্দের সংযোজন হয়েছে সে সব স্থান ও পাত্রই যা উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিশেষ ফরমান আছে। স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাক্কাঃ মাদীনাঃ ও আল-বায়তুল মুকাদ্দাস/কুদ্‌স। মাক্কার গুরুত্ব পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ অবধি। আল-বায়তুল মুকাদ্দাস/কুদস ইবরাহীম ('আলাইহিস সালাম)'র স্মৃতি বিজড়িত বহু নাবীদের জন্মস্থান। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তীর্থস্থান; মুসলিমদের প্রথম কিবলাঃ। মাদীনাতুন্নাবী অর্থাৎ মাদীনাঃ তো বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র হিজরতের স্থান, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ইসলাম প্রচার ও সম্প্রসারণের মূল উৎস।

তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সময়ে এবং পরবতীকালে কয়েক হিজরী পর্যন্ত মাক্কা, মাদীনাঃ এবং জেরুজালেমের সাথে শারীফ শব্দের সংযোজন হয় নি। এবং মুকাররমাঃ বা মু'য়াযযমাঃ ও মুনাওয়ারাঃ যোগ হয় নি। পরবতীকালে এসব বিশেষণ যোগ হয় এবং লোকে সেভাবেই বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই তিন স্থানের মাসজিদের যিয়ারতের জন্যই সফর অনুমোদন করা হয়েছে যা শারী'য়তসম্মত। (হাদীস পূর্বোল্লেখিত) এ ছাড়া অন্য কোন স্থানের শার'য়ী গুরুত্ব নেই বা যিয়ারতও নেই এবং শারীফও বলা যাবে না।

মাক্কাঃ, মাদীনাঃ ও কুদস ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানকেও শারীফ বলা হয় না যেমন মিনা, মুযদালাফাঃ, আরাফাত, কুবা, বদর, উহুদ, মিকাতের স্থানসমূহ ইত্যাদি। এসব স্থানগুলোর সাথে শারীফ শব্দের সংযুক্তি হয় নি যদিও মুসলিমদের কাছে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম; অথচ কোন বুযুর্গ, পীর, ওলীর বা কোন সূফীর কবরস্থানের কারণে সে নগরীর শেষে শুরু হয়েছে সম্মানসূচক উপাধি শারীফ যেমন আজমীর, বাগদাদ, বিহার, শর্ষিণা, ফুরফুরা ইত্যাদি। এসব স্থান এখন 'উরস বা উৎসবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ককরতঃ নির্দেশ দিয়েছেন :

আবূ হুরাইরাঃ (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার কবরকে তোমরা উৎসবাগারে বা ঈদগাহে পরিণত করো না; আমার প্রতি সালাত (দরূদ) পড়; তোমরা যেখায় থাক তোমাদের সালাত আমার কাছে পোঁছে যাবে। ১

আল্লাহর শুকর! শির্ক নির্মূলকারী আল-মাহীর (রাসূলুল্লাহর অপর নাম) কবরখানা শির্কের আড্ডাখানা বা 'উরস বা উৎসবাগারে পরিণত হয় নি; কিন্তু কোন বুযুর্গের বা সৎ লোকের করবস্থান মাযার হযে গিয়েছে এবং তা শির্কের জমজমাট ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে - যা একেবারেই ইসলামবিরোধী।

কবরস্থানই শির্কের প্রসূতিগার। পূর্ববতী কাওম কবরস্থানকে পূজা করার স্থান বা শির্কের আড্ডাখানায় পরিণত করেছিল।

'আয়েশ্যা (রাদী আল্লাহু 'আনহ্যা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারা (খৃষ্টানদের) উপর আল্লাহর অভিসম্পাত নিপতিত হোক কেননা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে তারা মাসজিদে পরিণত করেছে। ২

কবর যিয়ারতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদা সতর্ক ছিলেন। প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি তা অনুমোদন করেন; সুতরাং কবর যিয়ারত জায়েয বা অনুমোদিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি সপ্তাহে দু-দিন বাকী'তে (মাদীনার কবরস্থান) কবর যিয়ারত করতেন। উহুদের শাহীদদের যিয়ারত করতেন। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো ঃ মৃতদের জন্য দু'য়া করা, নিজেদেরকে ঐ অবস্থান জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং আখেরাতের স্মরণ ইত্যাদি।

---

১. আবূ দাউদ-নং ২০৪২; আহমদ-নং ৮৫৮৬।

২. আল-বুখারী-নং ৪৩৬; মুসলিম-নং ৪৪৪১; আন-নাসা'য়ী-নং ৫৩০; আবূ দাউদ-নং ৩২২৭; আহমদ-নং ১৬৯৩; মালেক-নং ৪১৬; আদ-দারেমী-নং ১৪০৩।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিন্তু কবরস্থানকে মাযার আখ্যা দেন নি বা শারীফ শব্দের সংযোজন করেন নি। এবং তার পরবর্তী সাহাবী, তাবে'য়ীদের শ্রেষ্ঠযুগেও তা হয় নি। এবং সে যুগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কবরকে রওজা মুবারকও বলা হয় নি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

আমার ঘর ও আমার (মাসজিদের) মিম্বারের মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান এবং আমার মিম্বার হাওদের/হাউজের উপর।১

মাসজিদে নাবায়ীর বিশেষ অংশকে রওদা বলা হয় কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় তা ঘোষণা করেছেন; তাহলে তাঁর কবরকে কোন যুক্তিতে রওজা শরীফ বা রওযা মুবারক বলা হয়?

হিজরী চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দী থেকে সূফী প্ররোচনায় বাতিলপন্থী কবরপূজারীগণ কোন বিশেষ ব্যক্তির কবরস্থানকে শারীফ আখ্যায়িত করে সেখানে শিরকের প্রচলন ঘটায়। প্রশ্ন ঃ যদি কোন বুযুর্গ, ওলী, দরবেশ বা বিশেষ ব্যক্তির কবরস্থানের কারণে তা শারীফখানায় পরিণত হয় তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানকেই শারীফ আখ্যা দিতে হয়; কেননা দুনিয়া সর্বত্রই রাসূল ও নাবীদের কবর আছে। বানূ আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন রাসূলগণ, তারপর নাবীগণ তারপর সিদ্দীকীন, হাওয়ারিয়্যূন, তারপর সাহাবী, শুহাদা, তাবে'য়ী, তাবে' তাাবে'য়ী, মুসেনীন, মু'মিনীন এবং মুসলেমীন ইত্যাদি। রাসূলগণের ও নাবীদের সংখ্যা এক লাখ; মতান্তরে এক লাখ চব্বিশ হাজার। তাদের প্রথম বিশ্বাসী ব্যক্তিদের (সিদ্দীকীন) সংখ্যাও অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র

সাহাবী সংখ্যা দু-লাখ এবং তাদের পরবর্তী অনুসারীদের সংখ্যা তো অসংখ্য। রাসূল ও নাবীদের কবর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বিশেষ করে আল-বিলাদ আশ-শাম বা শামদেশ (যা বর্তমানে সিরিয়, লেবানন, জর্ডান ও প্যালেস্টাইন)। প্যালেস্টাইন তো অধিকাংশ রাসূল ও নাবীদের জন্মস্থান এবং সেখানেই তাদের কবর আছে- তাহলে সমস্ত আল-বিলাদ আশ-শাম বা শাম দেশের গ্রাম, গঞ্জ, শহর সবই শারীফুশ শারীফ হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে বাদর এবং উহুদের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; সেখানে শাহীদদের কবর আছে অথচ সে স্থানগুলো শারীফ আখ্যা পায় নি বা মাযারও বলা হয় না অথচ পীর, ওলী, দরবেশ ও বুযুর্গদের কবরস্থানকে এখন মাযার শারীফ আখ্যা দেয়া হচ্ছে এবং সেখানে ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের পীঠস্থানে পরিণত করা হয়েছে।

---

১. আল-বুখারী - নং ১১৯; মুসলিম - নং ১৩৯১; আন-নাসায়ী - নং ৫৩০; আবূ দাউদ- নং ৩২২৭; আত-তিরমিযী -নং ২৪৬০; আহমদ - নং ১৬৯৩।

কোন পীর, ওলী, বুযুর্গ ও দরবেশ কখনই রাসূল, নাবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সাহাবী এমনকি তাবে'য়ীনদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না; এদের কবরস্থানকে মাযার শরীফ, রওজা শরীফ ইত্যাদি কোন বিশেষণ লাগান হয় না কিন্তু তথাকথিত বুযুর্গের কবরস্থানকে তা বলা হয়ে থাকে। এভাবেই সে সব তথাকথিত শালীফ স্থানগুলো উরস/উৎসবের কেন্দ্র, শিরকের পীঠস্থান, শয়তানী আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে যা ইসলামের বুনিয়াদ তাওহীদবিরোধী কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত।

কবরস্থানের কারণে কোন স্থান শারীফ আখ্যা পায় না, পাবেও না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র জীবদ্দশাতেই মাদীনাঃ হারাম/পবিত্র হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল; তাঁর মৃত্যুর পরে নয় বা তাঁর কবরস্থানের সম্মানেও নয়। তাহলে কিভাবে কোন বুযুর্গের কবরস্থান শারীফ হয়। আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী, নিযামুদ্দীন (রহ.) আরও অনেক আওলিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; ইসলাম প্রচারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা তাওহীদ প্রচারে জীবন ব্যয় করেছেন; শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। আর তাদেরই কবরকে শিরকের আড্ডাখানা বানান হয়েছে। বড় আশ্চর্য্যের কথা? বড় দুর্ভাগ্যের কথা।

পরিশেষে উপরোক্ত হাদীসের প্রতিধ্বনি করে বলি ঃ আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপরে যারা পীর, ওলী, দববেশ বা বুযুর্গেদের কবরস্থানকে মাসজিদে পরিণত করেছে এবং কবরস্থানকে শারীফ আখ্যা দিয়ে তা যিয়ারতের স্থান (মাযার)'এ পরিণত করেছে এবং রওযা মুবারক ইত্যাদি অনেক মনগড়া উপাধি লাগিয়ে ব্যবসা ও ফিতনার জমজমাট আখড়া তৈরি করে নিয়েছে।

****

পরিশিষ্ট

শেষ করে পুনরায় শুরু করলে বিস্মিত পাঠক প্রশ্ন করবেন : আবার শুরু কেন শেষ তো হলোই? জবাবে চুপি চুপি বলি তাদেরকে ঃ শেষ কিছুরই হয় না। উপসংহারের অন্তে থাকে পরিশিষ্ট, পরিশেষের পর পুনশ্চ।

মুসলিম সমাজে বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে এমন কিছু কথা ও পরিভাষা প্রচলিত যা ইসলামবিরোধী; সুতরাং এ ধরনের কথা ও ভাব থেকে প্রত্যেক মুসলিমের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মানুষের অজ্ঞাতে, অজান্তে, অবহেলায়, অগোচরে এমন কিছু কথা ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয় যা অত্যন্ত ভয়াবহভাবে ইসলাম পরিপন্থী হয়ে হয়ে থাকে। ছোট ছোট কথার বিন্দু ধীরে ধীরে সিন্দুতে পরিণত হয়। তিল জমা হতে হতে তাল হয়। সামান্য কথার পাপ ধীরে ধীরে বৃহৎ পাপের আকার ধারণ করে। ছোট শিরক বড় শিরকে রূপ নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে শিরক এমনভাবে অদৃশ্যগোচর হযে সুপ্তভাবে বিরাজ করবে যেমন অন্ধকার রাতে পিঁপড়ে চলার মতোই অশ্রুত ও অলক্ষণীয়। তাই আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন নইলে শিরকের পাপে নির্মজিত হতে হবে। এ ধরনের কিছু কথার নমুনা ঃ

- ☞ আল্লাহ যা চান আর আপনি যা চান ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাছে এসে একজন বলল ঃ আপনি যা ইচ্ছা করেন আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন : তুমি কী আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানে চাও? বলো : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তারপরে তুমি যা ইচ্ছা করো। (হাদীস – সাহীহ)। আল্লাহর ইচ্ছা সব বিষয়েই কার্যকর। মানুষ তার ক্ষমতার আওতাধীনে কাজ করতে সক্ষম। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সাথে মানুষের সসীম ক্ষমতা একাকার করলে তা শির্ক।
- ☞ আহা! যদি এটা করা হতো তা হলে এটা হতো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে কোন কথা বলতে নিষেধ করেছেন বরং বলতে শিক্ষা দিযেছেন : বলো, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই-ই হয়েছে। যদি শব্দটা শয়তানী কথা। (হাদীস-সাহীহ)। আল্লাহ যা নিদ্দিষ্ট করেছেন তাই-ই হয়ে থাকে; কারুর কোন ইচ্ছায় বা কর্মে কোন কিছুরই পরিবর্তন হয় না।
- ☞ আল্লাহর দরবার ঃ দরবার শব্দটি ফারসী এর অর্থ সভা, মাজলিশ। রাজা বাদশাহদের পাত্র-মিত্র, সভাসদ, মন্ত্রীমন্ডলী নিয়ে বসার বিশেষ স্থান যেমন রাজ দরবার, মোগল দরবার, বাদশাদের মাজলিশ, নবরত্নসভা। রাজ দরবারে রাজকীয় আলোচনা হয়। কখনও কবিতার আসর বসে, সঙ্গীত

পরিচালিত হয়, কোন কোন বাদশার দরবারে বাইজী নাচের আসরেরও ব্যবস্থা ছিল। আবার কখনো রাজা-বাদশাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকে। রাজ-দরবারে রাষ্টীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে দরবারে রাজা বা বাদশাহর ফরমান বদল হতে পারে ও বাতেলও হতে পারে। এ দুনিয়াতে পীরেরও দরবার থাকে। সেখানে মানুষ চাইতে যায়। খাজা বাবা বা পীর বাবার দরবার থেকে কেউই নাকি খালি হাতে ফিরে না। পীর বাবা বা খাজা বাবা মৃত; সে আমাদেরই দু'য়ার মুখাপেক্ষী বা মুহতাজ। সে কাকে কী দিবে? দিতে অক্ষম। এটাই হলো বড় শির্ক অর্থাৎ শির্ক ফিদ্দু'য়া। পৃতিবীর রাজা-বাদশাহদের দরবারে আর পীরের দরবারের সাথে আল্লাহর দরবারের কোনই মিল নেই। আর তা বলা হলে তাঁরই মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ বা তুলনা করা হবে যা হারাম। আল্লাহর দরবার বলে কোন কথাই কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে 'ইনদাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বা আল্লাহর নিকটে বা সমীপে। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো মহান আল্লাহ কোন মাখলুকের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না বা সেখানে দরবার বা এ ধরনের কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় নি। কেউকে জমাযেতও করেন না। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক। মহাবিশ্ব পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

☞ এলাহী কান্ড বা কারবার ঃ ইলাহ হচ্ছে এমন এক সত্ত্বা যা 'ইবাদতের হকদার। মুসলিমদের ইলাহ হলেন একমাত্র আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ... ইসলামের বুনিয়াদী কথা। এলাহী কান্ড বা কারবার বলতে সাধারণ অর্থে আল্লাহর কান্ড বা ব্যাপার। মানুষ কোন বড় ধরণের কাজ করে এলাহী কান্ডের শাব্দিক অর্থ আল্লাহর কাজের সাথে তুলনা করতে চায় বা সে কাজের 'আযমত/মর্যাদা বুলন্দ করতে চায়। মানুষের কাজ যত বড়ই হোক তা আল্লাহর কাজের সাথে তুলনা চলে না আর করলে আল্লাহর শান বা মর্যাদাকে খাটো করা হয়। মানুষের কাজা তার সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী। তা কিভাবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সাথে তুলনীয় হতে পারে? যে আল্লাহর ক্ষমতাকে মানুষের ক্ষমতার (সৃষ্ট কাজের) সাথে তুলনা করল সে আল্লাহর অমর্যাদা করল।

☞ একেশ্বরবাদ ঃ একেশ্বরবাদ হলো এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মতবাদ। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে এ শব্দের অর্থ করেছেন : আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়-এই মতে বিশ্বাসী। বাংলা একাডেমী এ শব্দের অর্থের সুবিচার করে নি, অনেক মুসলিম লেখকগণও তা করেন না। অনেকে তাওহীদ শব্দের প্রতিশব্দ লেখেন একেশ্বরবাদ।

☞ এ বইয়ে আল্লাহ না খোদা প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচন করা হয়েছে এবং যথার্থ যুক্তি ও দলীল দ্বারা প্রমান করা হয়েছে যে মুসলিমদের

জন্য ঈশ্বর ও ভগবান এমনকি খোদা শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাওহীদের প্রতিশব্দ করা যেতে পারে একাল্লাবাদ বা আল্লাহর একাত্ববাদ।

☞ উৎসর্গ ঃ কোলকাতার চলন্তিকা আর ঢাকা বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক অভিধান অনযায়ী এ শব্দের অর্থ ঃ সুদদ্দেশ্যে অর্পন বা বিসর্জন, দেবতাকে নিবেদন। উৎসর্গ কথাটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় যার মধ্যে ভক্তি-ভালবাসা, আন্তরিকভাবে নিবেদন, আত্মসমার্পন, ত্যাগ ইত্যাদি ভাবের সমন্বয়। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ গ্রহণ করলে তা আত-তাওহীদ উলুহীয়্যার রূহ পরিগ্রহ করতে পারে যেমন ইখলাস, মুহাব্বত, ইসতিসলাম, নাযর ইত্যাদি। এ সব শব্দগুলো 'ইবাদতের বিভিন্ন রূপ বা পদ্ধতি। হিন্দুরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আর মুসলিমগণ উৎসর্গ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই। হিন্দুদের উৎসগের পদ্ধতি আর মুসলিমদের উৎসর্গের পদ্ধতি ভিন্নমুখী। উৎসর্গ শব্দটি নাযর (নযর/নজর) শব্দের প্রতিশব্দ বা কাছাকাছি। ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকৃত কুরআনের তর্জমায় এ কথাই ব্যবহৃত হয়েছে। সূরাঃ আলে-'ইমরানের ৩৫ নং আয়াতের তর্জমাঃ "স্মরণ কর, যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, " হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহ আছে তাহা একান্ত তোমার জন্যই উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং আমার নিকট হইতে উহা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" ইন্নী নাযারতু লাকা অর্থাৎ আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ করলাম। তাহলে নাযর শব্দের অর্থ উৎসর্গ। উৎসর্গ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে অন্যের উদ্দেশ্যে হবে না। আর তা করা হলে আল্লাহর সাথে শির্ক করা হবে যা শির্ক ফীল 'ইবাদাঃ হিসাবে গণ্য হবে।

বাংলা ভাষায় বইয়ের মধ্যে উৎসর্গ শব্দটি ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দু লেখকগণ তা করে থাকলে তাদের জন্য ঠিক। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নরই নারায়ণ। কোন নরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে তা নারায়ণরকেই করা হলো। মুসলিম লেখকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে শিরকের খপ্পরে পড়ে যাবেন। এমনকি নাবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নামেও উৎসর্গ করার কোন শারী'য়ী দলীল নেই। নাবীর উপর সালাত ও সালাম বা দরূদ পড়ার জন্যই আমারদরকে আদেশ করা হয়েছে।

বই লিখে কাউকে উৎসর্গ না করে মুসলিমদের ব্যবহার করা উচিত ঃ উপহার, তুহফাঃ, হাদীয়াঃ অথবা অমুকে করকমলে, অমুকের দস্তমুবারকে; শ্রদ্ধা বা স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ, অমুকের স্মৃতির স্মরণে ইত্যাদি। কোলকাতার স্বনামধন্য লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার কয়েকটি উপন্যাসে স্বরণে শব্দটি ব্যবহার করেছেন; উৎসর্গ ব্যবহার করেন নি।

মুসলিম লেখকদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ না করাই উচিত।

পৃষ্ঠা নং ৯৬

☞ তীর্থ ঃ এ শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে পূণ্যস্থান, দেবতা মহাপুরুষ ইত্যাদির লীলা বা অধিষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত স্থান যেমন তীর্থযাত্রা, তীর্থযাত্রী, তীর্থস্থান, তীর্থকাব্য, তীর্থেরকাক ইত্যাদি। (চলন্তিকা)। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী তীর্থ কথার অর্থ লেখতে গিয়ে তীর্থ শব্দকে খাতনা করে মুসলিম করেছেন কিন্তু কালেমা পাড়ান নি। তারা এ শব্দের অর্থ লেখেছেন ঃ ১. পবিত্র স্থান, বিশেষ পূণ্যস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ; হিন্দু দেবতা বা মহাপুরুষদের অধিষ্ঠানভূমি, পূণ্যস্থান। ২. পাপমোটন (মক্কা তীর্থ) ... তীর্থ শব্দটি মুসলিম পরিভাষায় হাজ্জ হবে না কেননা হাজ্জের পটভুমিকা আর তীর্থের পটভুমিকা ভিন্ন। তীর্থ সাদের সঙস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য ঠিক আছে কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সাথে তা একেবারেই বেমানান।

☞ সতীর্থ ঃ সতীর্থ কথার অর্থ হলো এই গুরুর ছাত্র। সমান+তীর্থ(গুরু) = সতীর্থ। তীর্থ শব্দের অন্য অর্থ গুরু। এটা বৈদিক সংস্কৃতির কথা; মুসলিম সংস্কৃতির নয়। সতীর্থের পরিবর্তে সহপাঠী ব্যবহার করা যায়।

☞ পূজা ঃ এ শব্দের আভিধানিক অর্থ : অর্চনা, অরাধনা, উপাসনা। পূজা একান্তভাবেই হিন্দুদের নিজস্ব ব্যপার। পূজার তাৎপর্য বুঝতে হলে তাদের ধমীয় অনুষ্ঠানের পদ্ধিতির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। পুরোহিত ছাড়া পূজা হতেই পারে না এ কথা সকলের জানা কেননা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারুরই পূজার অধিকার নেই।

... উল্লেখ্য যে বৈদিক যুগের বহু পরে হিন্দুদেরকে বিভ্রান্ত করতঃ নিজেদের অর্থাগম ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ যে এ সব মূর্তি এবং এ ধরনের পূজার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। ... হাতে গড়া পুতুলকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করা যে অন্যায় এবং জুজকেরা যে বুদ্ধিহীন ও পাপীষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবদগীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সে কথা পুঃন পুঃন বলা হয়েছে; মানুষের সাধারণ বিবেকও তাই বলে।" গীতা (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য)

পূজা ছাড়াও তাদের অন্য ব্যবস্থা আছে যেমন তর্পন, অর্ঘ্য, জপ-তপ, যজ্ঞ, হোম, স্তব-স্তুতি পাঠ ইত্যাদি।

পূজা শব্দের প্রতিশব্দের 'ইবাদত হতেই পারে না। কোন কোন কুরআনের তর্জমায় 'ইবাদতের পরিবর্তে পূজা ব্যবহার করেছেন তর্জমাকারীরা যেমন সূরাঃ ফাতেহায় ঃ "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'য়ীন" - এ আয়াতের তর্জমায় করা হয়েছে : আমরা তোমারই পূজা করি এবং তোমারই সাহয্য চাই। কুরআনের 'ইবাদত শব্দের তর্জমায় পূজা শব্দটি

ব্যবহার করে এক বালতি দুধের মধ্যে একফোঁটা গো-চনা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

সঠিক তর্জমাঃ হবে : আমরা কেবলমাত্র তোমারই 'ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।

পৃষ্ঠা নং ৯৭

'ইবাদত শব্দটির প্রতিশব্দ পূজা হতেই পারে না। যারা তা ব্যবহার করে কুরআন তর্জমায় তাদের হক/অধিকার আর থাকে না কেননা প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ, তাৎপর্য এবং পটভূমিকা সম্পর্কে তারা সচেতন নয়।

কোন মুসলিম লেখক তার বিশেষ কবিতায় লিখেছেন : পূজ্যপাদ আলীজাদা ইমাম হোসেন। পূজ্যপাদ ব্যবহার করে তিনি ইমাম হোসেনের মর্যাদা তুলে ধরতে চাইলে তিনি ইসলামবিরোধী কাজ করেছেন। মুসলিমরা কোন ব্যক্তির পদপূজা করতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এরা নরপূজা বা মানুষপূজা। ইসলামে নরপূজা জঘণ্যতম পাপ হিসাবে বিবেচিত।

☞ স্বর্গ ঃ স্বর্গ হলো দেবতাদের বাসস্থান, মহাসুখের স্থান। সেখানে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা নামক বহু সংখ্যক নারী রয়েছে যাদের কাজ হলো দেবতাদেরকে দেহদান করে তাদের মনোরঞ্জন করা। এ ছাড়াও তাদের কাজ হলো স্বর্গগমনেচ্ছু অসুর অর্থাৎ সুর বা দেবতা নয় এমন কোন ব্যক্তি সৎকাজ বা তপস্যায় রত হলে তাকে ভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন করে স্বর্গ গমনের পথ রুদ্ধ করা। হিন্দুমতে সশরীরে জীবিতাবস্থায় পদব্রজে স্বর্গে গমন করা যায় যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবসানে ধর্মপুত্র যুধিষ্টির স্বর্গে গমন করেছিলেন। হিন্দুধর্ম মতে স্বর্গ মত্যের কাছাকাছি; হিমালয়ের আশেপাশে কোথাও যেন অবস্থিত। স্বর্গ ও মত্যের মাঝে পথ নির্মাণও করা যায় ইত্যাদি। মুসলিদের জান্নাতের বর্ণনা বা বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তাই স্বর্গকে জান্নাতের প্রতিশব্দ করলে তা শুধু অন্যায়ই হয় না বরং জুলুম হবে।

আমার কথাটি ফুরালো কিন্তু নটে গাছটি মুড়োবার আগেই বিস্মিত পাঠক প্রশ্ন করবেন সে কী কথা? এই কী শেষ? তাদেরকে বলে রাখি এখনকার মতো শেষ হলেও কিন্তু সমাপ্তি নয়। পরবর্তী সংস্করণে এ ধরণের আরও কিছু বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে, যথার্থ দলীল সহকারে, পূর্ণ সম্ভারে প্রকাশ করা হবে - ইন শা আল্লাহ। তাই আপনারা সেদিনের জন্য অপেক্ষা করুন আর দু'য়া করতে থাকুন। আর সব কিছুই তো আল্লাহর হাতে। যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি জ্ঞান দান করেন। আর তাঁরই কছে আমরা তাওফীক কামনা করি...।

সংগ্রহ করুন

লেখকের অন্য আকর্ষণীয় বই

১. নামকরণে ইসলামী পদ্ধতি (চতুর্থ সংস্করণ)
নামকরণের ব্যাপারে বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় বই। এ বইয়ের ইংরেজী, উর্দুও হয়েছে যা সারা বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত।
২. Islamic Education Series (1-10)
সা'য়ুদী 'আরবের অনেক International School-এ এবং পৃথিবীর অনেক দেশের স্কুলে পাঠ্যবই হিসাবে পড়ান হচ্ছে। সা'য়ুদী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বইগুলো অনুমোদিত এবং সেখানকার International School এর জন্য এগুলো পাঠ্যবই করার জন্য বলা হয়েছে।
৩. কুরআনুল কারীম জুয 'আম্মার তর্জমাঃ
৪. ছোট গল্প (মাক্কার পটভূমিকায়) (প্রকাশের পথে)
৫. অনুবাদ ঃ
ক) কুরআনুল কারীমের জুয 'আম্মা'র তর্জমাঃ
খ) ইসলামী 'আকীদাঃ (সংক্ষিপ্ত) শায়খ মুহাম্মদ জামীল যীনু।
গ) হাজ্জ ও 'উমরার নিয়মাবলী; প্রণয়নে রিয়াসাতুল হারামাইন বিনামূল্যে বিতরণ।
ঘ) হাজ্জ ও 'উমরার নিয়মাবলী; হাইয়াতুল ইগাছাঃ, মাক্কাঃ, বিনামূল্যে বিতরণ।
আরও কিছু বইয়ের তর্জমাঃ ও প্রকাশের পথে।
৬. সম্পাদনা ঃ
বাংলা তর্জমাঃ শারহ্ আস-সুদূর ইমাম আশ-শাওকানী (র.) প্রত্যেক মুসলিম ঘরে রাখার মতো প্রয়োজনীয় বই সা'য়ুদী 'আরবের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলিমই অজ্ঞ ও উদাসীন। সে সব অজ্ঞতা ও কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটি নিবারণের জন্য এ বইটি এক উপযুক্ত প্রতিষেধক।

বিষয়বস্তু আসাসী বা মৌলিক। উপস্থাপনা যথার্থ প্রমাণসিদ্ধ। ভাষা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও ছন্দোময়। রচনাশৈলির চমৎকারিত্ব, উপস্থাপনার সৌষ্ঠব, বর্ণনার মাধুর্যে বইটি ইসলামী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক মুসলিম ঘরে থাকার মতো উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বই।

Legal Deposit No. 22/3194
ISBN: X.955-39-9960
মূল্য: ৫.০০ রিয়াল (5.00 Riyals)